মাধ্যমিক ভৌত-বিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

লোধ • রায়

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক ১৯৭৪ সালের স্থিরীকৃত নূতন পাঠ্যসূচী
অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর জন্য লিখিত।

(Vide vol. I of the Curriculum and Syllabuses for Reorganised Pattern of Secondary Education)

মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

(সপ্তম শ্রেণীর জন্য)

অধ্যাপক, সত্যেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ,
প্রধান অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ ; এ. পি. সি. রায় পলিটেকানক,
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।
General Chemistry, Chemistry for Engineers প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা,

ও

অধ্যাপক, বীরেন্দ্রকুমার রায়,
অধ্যাপক পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ; চারুচন্দ্র কলেজ,
লেক্ রোড, কলিকাতা
প্রণীত

১০, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
শ্রীদীনেশচন্দ্র বসু
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১০, বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৭৪

মূল্য : তিন টাকা মাত্র

[*Paper used for printing this book was made available by the Govt. of India at a concessional rate.*]

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস
৭৩, মানিকতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

8701

ভূমিকা

মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সপ্তম শ্রেণীর নূতন পাঠক্রম অনুসারে লিখিত ভৌত বিজ্ঞান পুস্তকখানি প্রকাশিত হইল।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে এই পুস্তকখানি বিজ্ঞান শিক্ষার সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইলে কৃতার্থ হইব। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানপাঠে আগ্রহী হইলে পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

আশা করি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী পুস্তকখানির ভুল-ত্রুটি নির্দেশ করিয়া ও মূল্যবান উপদেশ দিয়া বাধিত করিবেন।

সত্যেন্দ্রচন্দ্র লোধ
বীরেন্দ্রকুমার রায়

ডিসেম্বর, ১৯৭৪

SYLLABUS

PHYSICS AND CHEMISTRY

CLASS—VII

1. What is Science ? Science involves observation, systemination of knowledge by observation, measurement and inference.

Rest and Motion.

Scope and applications of Science in life—Health, Sanitation, Food, Shelter, and in general benefit of mankind. How the thinking of great natural Philosophers through the ages has influenced the development of Science and Technology as we know it to-day. Brief mention of the contributions of Indian Philosopher and Scientists in this direction. (Short life stories of some eminent Indian Scientists—Acharyya Jagadish Chandra Bose, Acharyya Prafulla Chandra Ray, Prof. C. V. Raman. Prof. S. N. Bose, Prof. Prasanta Mahalanabis, Prof. Meghnad Saha etc.)

2. Air—Air has weight—Torricellis' Short life—His observations that a lift pump does not work if the level of water in a well drops below 34 feet—Atmosphere and Atmospheric pressure—Measurement of atmospheric pressure—Principle of the mercury barometer. What air is composed of ? Oxygen, Nitrogen, small quantities of carbon di-oxide and water vapour—Elementary idea of elements and simple compounds—Mechanical mixture. Separation of their constituents (individual properties retained)—Filtration, separation by magnets, Sublimation, distillation, decantation, Crystallisation etc.

3. Water—Demonstration of liquid—Pressure—Archimedes' Principle—Short life-story of Archimedes—Buoyancy, Flostetion—water finds its own level—demonstration and simple applications.

4. Matter—Different states of matter (solids, liquids and gases)—Physical properties of matter (Density, Hardness, odour, colour, weight dimensions, volume). Influence of external factors on properties—expansion of a body by heating—gap between Rail

lines—Ball and Ring experiment—Bi-metal-strip—its application. Elementary ideas of physical and chemical changes (to be illustrated by experiments) Atoms and molecules—short life stories of Dalton, Avogadro.

5. Gravitation—Earth attracts all bodies—Force of Gravitation —Falling bodies—dependence on mass and distance—Monn's Gravitation—short life story of Newton—Occurrence of tides—simple explanation.

6. Heavenly Bodies and Night sky—Observations on the Sun, the Moon's Phases and on the night-sky—Solar system—short life stories of Galileo. Copernicus and Kepler. Difference between planets and stars—Rectilinear propagation of light—Experiments—Pinhole Camera—Formation of shadows—umbra, penumbra—Eclipses (excluding annular eclipses) Laws of Reflection of light—simple experiment—Regular and diffused reflection—Periscope.

———

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় ঃ বিজ্ঞান কাহাকে বলে ? বিজ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্য ও ইহার বিভিন্ন বিভাগ, মানবসেবায় বিজ্ঞানের অবদান। কয়েকজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের জীবন-কাহিনী, স্থিতি ও গতি।	১—১৯
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বায়ু ঃ বায়ুর ওজন আছে। টরিসেলির জীবনী, বায়ুমণ্ডল ও তাহার চাপ, বায়ুচাপের অস্তিত্ব, টরিসেলির পরীক্ষা, ব্যারোমিটারের মূলনীতি। বায়ুর উপাদান। পদার্থের শ্রেণীবিভাগ। মিশ্র পদার্থ ও তাহার উপাদানের পৃথকীকরণ। পরিস্রাবণ, থিতান, কেলাসন, উর্ধ্বপাতন, পাতন।	১৯—৩৪
তৃতীয় অধ্যায় ঃ জল ঃ তরলের চাপ, স্থির তরলের উপরের তল সর্বদা অনুভূমিক, পরস্পর যুক্ত পাত্রের তরল একই তলে থাকে, 'তরল একই তলে থাকিতে চায়' ধর্মের প্রয়োগ, আর্কিমিডিসের সূত্র ও প্লবতা, আর্কিমিডিসের নীতির সত্যতা পরীক্ষা, আর্কিমিডিসের জীবনী, আর্কিমিডিসের সূত্র ভাসমান বস্তুর সাম্যাবস্থা, এবং ভাসমান অবস্থার কয়েকটি দৃষ্টান্ত, বায়ুর প্লবতা এবং আর্কিমিডিস সূত্রের প্রয়োগ।	৩৪—৫০
চতুর্থ অধ্যায় ঃ পদার্থ ঃ পদার্থের প্রকারভেদ, পদার্থের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম। পদার্থের ধর্মের উপর বহিঃ-শক্তির প্রভাব। তাপের প্রভাবে কঠিন বস্তুর	

প্রসারণ, প্রসারণে সুবিধা ও অসুবিধা, ইহাদের কয়েকটি উদাহরণ, বল ও রিঙের পরীক্ষা, যুগ্মদণ্ড ও ইহার ব্যবহার। ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন এবং ইহাদের উদাহরণ। অণু ও পরমাণু। ৫৯—৫৯

পঞ্চম অধ্যায় ঃ মাধ্যাকর্ষণ, অভিকর্ষ, চন্দ্রের অভিকর্ষ, পতনশীল বস্তুর সূত্র। নিউটনের জীবনী। জোয়ার ও ভাঁটা। ৫৯—৬৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ সৌরজগৎ ও আলো ঃ মহাকাশ, জ্যোতিষ্ক মণ্ডল, সৌর জগৎ, রাত্রির আকাশ। গ্যালিলিও, কোপার-নিকাস ও কেপলারের জীবনী। আলোর উৎস, মাধ্যম, রশ্মি, 'আলো সরলরেখায় চলে'—ইহার পরীক্ষা, সূচীছিদ্র ক্যামেরা, ছায়ার উৎপত্তি, প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া—ইহাদের উৎপত্তি, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ। প্রতিফলনের সূত্র, হার্টলের আলোকচক্র, প্রতিবিম্ব-গঠন, পার্শ্ব পরিবর্তন, সমান্তরাল ও সমকোণে আনত দুইটি দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন, পেরিস্কোপ ও ক্যালিডিস্‌কোপ। ৬৬—৯৬

মাধ্যমিক ভৌত বিজ্ঞান

প্রথম অধ্যায়

বিজ্ঞান কাহাকে বলে

১.১. মানুষ জন্ম হইতেই কৌতূহলী। মানুষের মনে দীর্ঘকাল হইতেই তাহার পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে বহু প্রশ্ন জাগিয়াছে। বহুদিন সাধনার ফলে মানুষ বুঝিয়াছে জড়, শক্তি ও চেতনা এই তিনটি উপাদানের সাহায্যে এই বিশ্বজগতের প্রকাশ। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা জড় ও শক্তির অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। আদিম মানুষ পশুর ন্যায় ছিল। তখন সে অবাক হইয়া দেখিত যে, সূর্য আলো ও তাপ দেয়, আবার আকাশে মেঘ জমে, বজ্র ও বিদ্যুৎসহযোগে বৃষ্টির আকারে নামিয়া

একদিন এক গুহাবাসী কাঠে কাঠ ঘষিয়া আগুন জ্বালিল ও ছেলেকে বলিল—দেখিস আগুন যেন না নিভে যায়। ছেলেটি হাতের কাছে যাহা পাইল আগুনে ফেলিল। বুঝিল সব জিনিসই দাহ্য নয়।

আসে।—ইহারা যে এক একটি শক্তি, বহুদিন পরে মানুষ তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল।—একদিন জন্তু শিকার করিতে গিয়া আদিম মানুষ একখণ্ড প্রস্তর ছুঁড়িয়া মারিল। পাহাড়ের গায়ে লাগিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হইল। ইহা হইতেই মানুষ আগুন জ্বালিতে শিখিল।

পাথরে পাথর ঠুকিয়া আগুন জ্বালানো কষ্টসাধ্য বলিয়া তাহারা আগুন নিভাইত না। হাতের কাছে যাহা পাইত তাহাই আগুনে ফেলিত। দেখিল যে, সকল জিনিসই আগুনে জ্বলে না। কিছু জিনিস যেমন, কাঠ, পাতা ইত্যাদি দাহ্য। কিন্তু পাথর অদাহ্য। এইভাবে ইন্দ্রিয়লব্ধজ্ঞানকে মানুষ কাজে লাগাইল। পরবর্তীকালে এই সমস্ত জ্ঞানকে যুক্তিসংগত ও সুসংবদ্ধ করিতে গিয়া দেখিল যে, বিশ্বজগতের অসংখ্য ঘটনা কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলে। এই বিধিনিয়ন্ত্রিতজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলে। সেইজন্য বিজ্ঞানের অপর নাম বিশেষ জ্ঞান। বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস যে, জগতের ঘটনা কতকগুলি শৃঙ্খলা বা নিয়মের বন্ধনে চলে। প্রকৃতিরাজ্যে কোন খামখেয়ালী ঘটনার সংঘটন সম্ভব নয়। সব কিছুতেই আছে নিয়মের প্রতিপত্তি। আমগাছ হইতে আম সব সময় নীচের দিকেই পড়ে, কখনও সবেগে আকাশে উঠিয়া যায় না। জলকে বিশ্লেষণ করিলে সবসময়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়।

১.২. **বিজ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্য ও ইহার বিভিন্ন বিভাগ ঃ** আমাদের বিজ্ঞান সাধনার দুইটি দিক আছে। মানুষ তাহার ক্ষুৎপিপাসা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার প্রয়োজনে বিজ্ঞানের চর্চা করে। ইহাকে ব্যবহারিক বিজ্ঞান বলে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির রাজ্যে বিভিন্ন ঘটনাবলীর রহস্য উদঘাটন করিতে চেষ্টা করে।—এই দিকটি মানুষের চিরন্তন বিজ্ঞানের ফল। আলোচনার সুবিধার জন্য বিজ্ঞানকে দুইটি সুস্পষ্ট শাখারূপে বিভক্ত করা হইয়াছে। (১) প্রকৃতি বিজ্ঞান (Natural Science),—পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়নবিদ্যা (Chemistry), গণিতবিদ্যা (Mathematics), ভূবিদ্যা (Geology), জ্যোতির্বিদ্যা (Astronomy)। (২) জীববিজ্ঞান (Biology)—উদ্ভিদবিদ্যা (Botany), প্রাণীবিদ্যা (Zoology), শারীরবিদ্যা (Physiology),।

১.৩. পদার্থ বিদ্যার ক্ষেত্রে আর্কিমিডিস্ খ্রীস্টজন্মের প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে ভাসমান ও মজ্জমান পদার্থের রীতি নির্ণয় করিয়াছিলেন। যন্ত্রবিদ্যার অতিপ্রয়োজনীয় উপাদান লিভার, ওয়েজ প্রভৃতি তাঁহারই দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিওর আবিষ্কৃত দোলকের নীতি হইতে

হায়গেন্‌স্ দোলকঘড়ি নির্মাণ করিয়া সময় নিরূপণের অন্যতম উপায় উদ্ভাবিত করিলেন। টরিসেলির উদ্ভাবিত ব্যারোমিটারের সাহায্যে আজ আসন্ন আবহাওয়ার প্রকৃতি, পর্বতাদির উচ্চতা ও অপরাপর বৈজ্ঞানিক তথ্য অতি সহজেই নির্ধারিত হইতেছে। নিউটন প্রিজ্‌মের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে বিচ্ছুরিত করিয়া প্রকৃতির যে রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলেন, তাহার ফলে রামধনু ও বর্ণ সমস্যার সমাধান হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিউকোমেন, জেমস্ ওয়াট্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণের অসাধারণ ধীশক্তির ফলে বর্তমান স্টীম এঞ্জিনের সৃষ্টি হইল। তাহা দ্বারা নানাবিধ কলকারখানা চলিল; ইটালী দেশে ভল্টা তড়িৎ-প্রবাহ উৎপন্ন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। অ্যাম্পিয়ার প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিলেন। ফ্যারাডে জড় জগতের রহস্যের পর রহস্য উদ্‌ঘাটিত করিয়া তড়িৎ-শক্তিকে মানবের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন। আধুনিক বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক আলোক, বৈদ্যুতিক ট্রামগাড়ী, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাম, টেলিফোন ও ঘণ্টা তাঁহারই অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ। জার্মান বৈজ্ঞানিক রঞ্জেন এক অজ্ঞাতপূর্ব রশ্মির আবিষ্কার করিয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে নূতন যুগের প্রবর্তন করিয়াছেন। আমেরিকান অধ্যাপক ল্যাঙ্‌লির প্রচেষ্টার ফলে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় পেট্রোল-চালিত এঞ্জিনের সাহায্যে আকাশে বিমান চালাইয়াছিলেন। জার্মান পণ্ডিত প্ল্যাঙ্ক কোয়ান্‌টমবাদ প্রচার করিয়া রশ্মির প্রকৃতি সম্বন্ধে নূতন ব্যাখ্যা দিলেন। অলৌকিক প্রতিভাশালী জার্মান পণ্ডিত আইনস্টাইন আপেক্ষিক তত্ত্ব প্রচার করিয়া দেশ ও কাল সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মনে অভিনব চিন্তা ও আলোড়ন সৃষ্টি করিলেন। পদার্থের বিলোপে শক্তির উদ্ভব হয় এবং শক্তির বিলোপে পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব; সুতরাং পদার্থ ও শক্তিকে বিভিন্ন প্রকার বস্তু বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে। পদার্থের বিলোপে কি বিরাট ও প্রচণ্ড শক্তির উদ্ভব সম্ভব তাহা আইনস্টাইন হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন। এ্যাটম বোমার সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে বহু বৈজ্ঞানিকের পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও পরীক্ষা। ইটালীর বৈজ্ঞানিক মার্কনি বেতার সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্তে মুহূর্তমধ্যে সংবাদ প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

১.৪. রসায়নের ইতিহাস দীর্ঘবিস্তারী ঃ

আদিযুগ ঃ প্রাগৈতিহাসিক ও উহার সমসাময়িককালে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্যান্য যে সকল দেশে রসায়নের চর্চা হয়, তাহার মধ্যে প্রাচীন মিশরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন মিশর বা 'খেম' কথাটি হইতেই ইংরাজী কেমিষ্ট্রি কথাটির উৎপত্তি। 'রসায়ন' শব্দটি সংস্কৃত ভাষা হইতে উদ্ভূত। মিশরের পর প্রাচীন গ্রীসে আরিস্তোতল (খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪-৩২২) প্রভৃতির দ্বারা তাত্ত্বিক রসায়নের বিকাশ হয়—এই সময়ে ফলিত রসায়নের চর্চা অল্পবিস্তর কুসংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে। বস্তুকে বিক্রিয়ার দ্বারা স্বর্ণে রূপান্তর, এই কল্পনা প্রাধান্য লাভ করে। এই যুগকে 'কিমিয়াবিদ্যার যুগ' বা 'অ্যালকেমির যুগ' বলা হয়। এযুগের উল্লেখযোগ্য রসায়ন-বিজ্ঞানী রোজার বেকন।

ভেষজ রসায়নচর্চার যুগ ঃ ইয়োরোপে নব্য-রসায়নের প্রথম পথিকৃৎ প্যারাসেলস্ (১৪৯৩-১৫৪১)। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রচেষ্টায়, অ্যালকেমি চর্চা হইতে রসায়নের লক্ষ্য পরিবর্তন হইয়া, ভেষজ-রসায়ন বা চিকিৎসা-রসায়নের সূত্রপাত হয়।

বায়ব রসায়নচর্চার যুগ ঃ প্যারাসেলসের পর রসায়নবিজ্ঞানে একটি নূতন যুগ আসে। এ যুগের পথিকৃৎ রবার্ট বয়েল (১৬২৭-৯১)। এই সময়ে রসায়নে, বায়ব বস্তুর আবিষ্কার ও উহাদের গুণাগুণ রাসায়নিকদের প্রধান দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ব্ল্যাক (১৭২৮-৯৯), ক্যাভেণ্ডিস (১৭৩১-১৮১০), প্রিস্টলে (১৭৩৩-১৮০৪), ল্যাভয়সিয়ে (১৭৪৩-৯৪) প্রভৃতির অবদানে রসায়নে বহু নূতন আবিষ্কার ও তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়।

আধুনিক যুগ ঃ ডাল্টনের (১৭৬৬-১৮৪৪) পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠা হইতে আধুনিক রসায়নের সম্পূর্ণাঙ্গ বলা যায়। এই যুগ হইতেই তাত্ত্বিক রসায়ন ও ফলিত রসায়নের পারস্পরিক সম্পূর্ণ সহযোগে রসায়নবিদ্যা দ্রুত বিস্তার-লাভ করিতে থাকে। গে-লুসাক, অ্যাভোগাড্রো, ক্যানিজারো, বার্জিলিয়াস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক রসায়নবিদ্ এবং অসংখ্য ফলিত রসায়নবিদের অবদানে রসায়নশাস্ত্র সামগ্রিকভাবেই সমৃদ্ধ হইয়া ওঠে। এই যুগের শেষার্ধে মেণ্ডেলিফের

পর্যায়-সারণী আবিষ্কারও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই আবিষ্কারের ফলে রসায়নবিজ্ঞানে চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন হয়।

সর্বাধুনিক যুগ : উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতেই, রসায়নশাস্ত্রে একটি বিস্ময়কর অগ্রগতির ও মৌল-পরিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করা যায়। নিষ্ক্রিয় মৌল গ্যাসবর্গের আবিষ্কার, তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার, রেডিয়াম ও সহধর্মী তেজস্ক্রিয় মৌলের আবিষ্কার, পারমাণবিক গঠন-রহস্য উদ্‌ঘাটন, আইসোটোপ আবিষ্কার ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এই সময়ে ঘটিতে থাকে।

১.৫. এইবার জীববিদ্যার কথা। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত জড় ও জীবকে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া অনুমান করা হইত। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে বৈজ্ঞানিক উহ্লার অজৈব পদার্থ হইতে জৈব পদার্থের সৃষ্টি করিয়া জড় ও জীবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। জীববিদ্যার ক্ষেত্রে পণ্ডিত লামার্ক ও ডারুইনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ডারুইন বলিলেন, নিম্নশ্রেণীর জীব হইতে উচ্চশ্রেণীর জীবের ক্রমবিকাশ হইতে থাকে। এই অভিব্যক্তিবাদের জন্য ডারুইনের নাম জীববিদ্যার ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয়। জীববিদ্যার পরিণত অবস্থায় জীবাণুতত্ত্বের উদ্ভব হইল। পাস্তুর প্রমুখ পণ্ডিতগণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় জীবাণুরাজ্যের রহস্য-যবনিকা অপসারিত করিলেন। মানব ও তাহার গৃহপালিত প্রাণীর কতিপয় সাংঘাতিক ব্যাধি জীবাণু কর্তৃক সংঘটিত হয়, তাহা প্রমাণিত হইল—শর্করা হইতে সুরা, দুগ্ধ হইতে দধি প্রভৃতির উৎপত্তির কারণ নির্দিষ্ট হইল। পাস্তুর ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুরের দংশনপীড়িত মানবের জীবনরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিয়া সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিলেন। লিস্টার চিকিৎসাশাস্ত্রে অস্ত্রোপচারের জন্য অভিনব প্রণালীর প্রবর্তন করিয়াছেন। অণুবীক্ষণের সহযোগিতায় এবং হারভির অসাধারণ প্রতিভার ফলে সপ্তদশ শতাব্দীতে শারীরবিদ্যা প্রভূত পরিমাণে প্রসারলাভ করিয়াছিল। হারভির রক্তসঞ্চালন বিষয়ক মত মালপিঘি কর্তৃক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইল। হেলার প্রমাণ করিলেন, নরদেহের মাংসপেশীর সঙ্কুচিত হইবার স্বাধীন ক্ষমতা আছে। শারীরবিদ্যার ক্ষেত্রে জন হাণ্টার, উইলিয়ম হাণ্টার এবং বেনেটের নামও চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

১.৬. জ্যোতির্বিদ্যা : প্রভাবে ও প্রবীণতায় জ্যোতির্বিদ্যা বিজ্ঞান-রাজ্যে গরিয়সী। খ্রীস্টীয় শতাব্দীর প্রবর্তনের বহু পূর্বে ভারতবর্ষ, ব্যাবিলোনিয়া, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি তদানীন্তন সভ্যদেশের পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্‌গণের মধ্যে টলেমি, পাইথাগোরাস্, কোপার্নিকাস, আর্যভট্ট, ভাস্করাচার্য ও ব্রহ্মগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। আধুনিক জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে গ্যালিলিও, নিউটন, ডাক্তার জিন্স, আইনস্টাইন ইত্যাদি মনীষিগণ সর্বপ্রধান।

খ্রীস্টজন্মের পূর্বে গ্রীক পণ্ডিত টলেমি বলিয়াছিলেন, পৃথিবী সৌরজগতের কেন্দ্র ; সূর্য ও গ্রহগণ তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মান পণ্ডিত কোপার্নিকাস সিদ্ধান্ত করিলেন, সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্র ; গ্রহ-উপগ্রহাদি তাহাকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইটালীয় পণ্ডিত গ্যালিলিও দূরবীক্ষণের সাহায্যে গ্রহ-তারকাদির সম্বন্ধে বহু তথ্য নির্ণয় করেন। তিনি বৃহস্পতির চারিটি উপগ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার অধ্যবসায়ের ফলে কোপার্নিকাসের প্রবর্তিত মতের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে নিরূপিত হইয়াছিল। লাপ্লাস ও হেলমহোলৎজ জগতের ভ্রূণাবস্থা হইতে তাহার ক্রমিক অঙ্গ-বিকাশ ও শক্তি সঞ্চারের সম্বন্ধে মূল্যবান তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। জগৎ আদিতে কেমন ছিল, তারপর কেমন হইল, এই সম্বন্ধে বহুবিধ বিবরণ বিজ্ঞানের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। আধুনিকদের মধ্যে ক্যাণ্ট বলিলেন, আদিতে সূর্য বা গ্রহ-উপগ্রহ ছিল না। সমুদয় জড়বস্তু বিস্তীর্ণ আকাশ মধ্যে গ্যাসের অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। তবে সে গ্যাস আমাদের বায়ুমণ্ডলের মত নহে ; বায়ু অপেক্ষা লঘু। সে গ্যাসে সোনা, রূপা, লৌহ প্রভৃতিও ছিল। জড়াণুর মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ ছিল। তাহার ফলে সেই গ্যাস স্থানে স্থানে জমাট বাঁধিয়া ক্ষুদ্র-বৃহৎ পিণ্ডে পরিণত হইয়া সূর্য ও গ্রহাদির সৃষ্টি করিল। পণ্ডিত হার্শেল বহুসংখ্যক নীহারিকার আবিষ্কারকর্তা। তিনি বলিলেন, ঐ নীহারিকা জগৎ-নির্মাণের প্রধান উপাদান। উহার কতকটা এখনও স্থানে স্থানে অবশিষ্ট রহিয়াছে।

এককালে উহাই সমস্ত বিশ্বব্যাপিয়া ছিল; কালে জমাট বাঁধিয়াছে, কোন স্থানে বা অদ্যাপি বাঁধে নাই।

লাপ্লাস বলিলেন, আদিকালে গ্যাসরাশি বিশাল আবর্তের মত একটা কেন্দ্রের চারিদিকে ঘুরিত। মহাকর্ষের প্রভাবে সেই আবর্ত ক্রমে ঘনীভূত হইতে লাগিল। তাহার পরিধির পরিসর ক্রমে কমিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে আবর্তের বেগও বাড়িল। আবর্তনশীল গ্যাসীয় পিণ্ডের মেরুপ্রদেশ ক্রমে স্ফীত হইয়া শেষ পর্যন্ত বলয়ের আকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। সেই বলয় আবার কালক্রমে ঘনীভূত হইয়া গ্রহে পরিণত হইল এবং কেন্দ্রবর্তী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। সূর্য বা তারকা হইতে যেরূপ গ্রহের উৎপত্তি, গ্রহ হইতে সেইরূপ উপগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাই হইল লাপ্লাসের মত।

বর্তমানকালে ডাক্তার জিন্সের মতে, কোন এক বিপুলকায় তারকা তাহার গতিপথে সেই উত্তপ্ত গ্যাসমণ্ডলের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে তাহার আকর্ষণে সেই গ্যাসের কতিপয় অংশ স্ফীতমধ্য পটলের আকার ধারণ করিয়া বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। পরে তাহাই আবার খণ্ডিত হইয়া গ্রহে পরিণত হইল। গ্রহ হইতে বিচ্যুত অংশ দ্বারা উপগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। তাহার পর অবিশ্রান্ত তাপ বিকিরণের ফলে পৃথিবীর দেহ ঘনীভূত ও সঙ্কুচিত হইতে থাকিলে ক্রমশঃ তাহার বহির্দেশ গ্যাসীয় হইতে তরল এবং তরল অবস্থা হইতে কঠিনত্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে পৃথিবীর উপরিদেশে একটি কঠিন বহিরাবরণের সৃষ্টি হইল। সঙ্কোচের তারতম্য অনুসারে সেই আবরণের কোন কোন স্থান বসিয়া গিয়া সাগর সৃষ্টি করিল; কোথাও বা উহা উন্নত হইয়া পর্বতে পরিণত হইল। এইভাবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারার উৎপত্তি হইয়াছে।

১.৭. মানব সেবায় বিজ্ঞানের অবদানঃ মানুষের প্রধান মৌলিক প্রয়োজনগুলি সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায়ঃ (১) আহার, (২) পরিধেয়, (৩) বাসস্থান, (৪) জীবনযাত্রার নানা উপকরণ ও (৫) চিকিৎসা। ইহার প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের অবদান আছে; ইহা ছাড়া সমষ্টিগতভাবে শিল্প ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের অবদান স্মরণীয়।

আহার্যের সংস্থান ও বিজ্ঞানঃ মানুষের প্রথম প্রয়োজন, আহার্যের

সংস্থানে—বিজ্ঞানের অবদান ত্রিবিধ ঃ—(ক) খাদ্যবস্তুর উৎপাদন, (খ) খাদ্যের সংরক্ষণ ও (গ) কৃত্রিম খাদ্য। গবেষণার ফলে, রাসায়নিক বিশ্লেষণলব্ধ জ্ঞানে,—মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয় খাদ্যরূপে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ ও ভাইটামিন (বা খাদ্যপ্রাণ) প্রভৃতি আবিষ্কার হইয়াছে। অন্যদিকে, কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, আজ প্রায় সকল দেশেই, কৃত্রিম রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ভারতেও অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার-ফসফেট ও অন্যান্য বহু কৃত্রিম সার কৃষিজমিতে ফলনবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হইতেছে। পূর্বে জীবাণুঘটিত কারণ ও অন্যান্য কীট-পতঙ্গের দ্বারা বহু ফসল অপচয় হইত ; বর্তমানে বিভিন্ন জীবাণুনাশক ও কীটনাশক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ করিয়া সেই অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হইয়াছে। অনাবৃষ্টির কালে কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে কৃত্রিম বৃষ্টিপাতও এখন সম্ভব। বিজ্ঞানের এইরূপ বহু অবদানের ফলে কৃষিজ-খাদ্যের খাদ্যগুণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি—ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যসমস্যার বহুল সমাধান করিয়াছে। উদ্বৃত্ত খাদ্যসঞ্চয় আগে সহজসাধ্য ছিল না ; বর্তমানে উন্নততর রাসায়নিক জ্ঞানের ফলে খাদ্যদ্রব্যের সংরক্ষণ সম্ভব। যেমন—গুঁড়া দুধ, গুঁড়া ডিম, গুঁড়া আম, শুষ্ক পেঁয়াজ ইত্যাদি—ইহা ছাড়া নানা কৃত্রিম রাসায়নিক খাদ্যও রসায়নের অবিস্মরণীয় অবদান। উদাহরণ—মাখন জাতীয় স্নেহ পদার্থের পরিবর্তে মার্গারিণ, ঘিয়ের পরিবর্তে ডালদা, চিনির পরিবর্তে স্যাকারিণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কৃত্রিম খাদ্যপ্রাণ বা ভাইটামিনবর্গের সংশ্লেষণে, প্রাকৃতিক উৎস ছাড়াও মানবদেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টির খাদ্য-চাহিদা আজ মিটান সম্ভবপর।

জীবনযাত্রার নানা উপকরণ ও বিজ্ঞান ঃ খাদ্যের পর মানবদেহের লজ্জানিবারণ ও শীতাতপ হইতে রক্ষার জন্য প্রয়োজন—পরিধেয়। বর্তমান উন্নততর বিজ্ঞানের জ্ঞানের ফলে,—কার্পাস, রেশম ও পশমের উৎপাদন প্রভূত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, কতকগুলি রাসায়নিক কৃত্রিম-তন্তু, যেমন, নাইলন, রেয়ন প্রভৃতি আবিষ্কারের ফলে, পরিধেয় সমস্যার যথেষ্ট সমাধান হইয়াছে। বিজ্ঞানে, সুলভ ও নূতন গৃহনির্মাণের উপাদান সম্বন্ধে

গবেষণার ফলে আজ বিজ্ঞানে উন্নত বহু পাশ্চাত্ত্য দেশেই সুলভে ও স্বল্পসময়ে
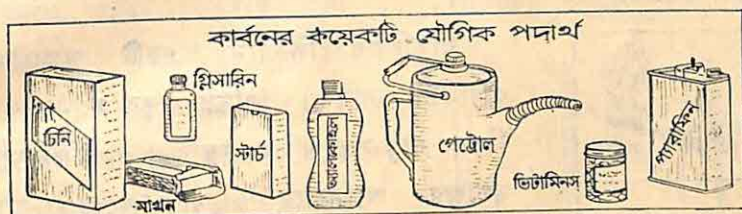
সুদৃঢ় গৃহনির্মাণ সম্ভবপর হইয়াছে। লিখিবার লেখনী ও কাগজ, জ্ঞান আহরণের সংবাদপত্র ও পুস্তকরাজি দিয়াছে এই বিজ্ঞানই।

চিকিৎসা ও রোগনিবারণে বিজ্ঞান: চিকিৎসা ও রোগনিবারণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিশেষ করিয়া রসায়নের অবদান সুপ্রাচীন। প্রাচীন ভারতীয় রসায়নের ইতিহাসে বহু মূল্যবান ঔষধের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাহা আজও চিকিৎসাক্ষেত্রে অপরিহার্য। ভারতীয় উদ্ভিজ্জ ঔষধের মধ্যে—সর্পগন্ধা (রক্তচাপে), অর্জুন (হৃদ্‌রোগে), কুড়চি (আমাশয়ে), বাসক (কাশরোগে) ইত্যাদির ব্যবহার সুবিখ্যাত। খনিজ ঔষধের মধ্যে—মকরধ্বজ একটি বিশ্ববিখ্যাত মহৌষধ। বর্তমানে উন্নততর রসায়নজ্ঞানের ফলে—চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রভূত উন্নতি ঘটিয়াছে। ম্যালেরিয়া—কুইনাইন, প্যালুড্রিন, অ্যাটেব্রিন ; হৃদ্‌রোগের—কার্ডিয়াজল, কোরামিন ; প্রকৃতপক্ষে ঔষধমাত্রেই বিজ্ঞানের, বিশেষ করিয়া রসায়নের অবদান বলিয়া আধুনিক ঔষধমাত্রেই রসায়নাগারে বিচক্ষণ রসায়নবিদ্‌দের সৃষ্টি বলা চলে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদান: উপরি-উক্ত অবদানগুলি ছাড়াও, সমষ্টিগতভাবে, বৃহৎ শিল্পগুলিও বিজ্ঞানের অবদান। এই অবদানগুলির মধ্যে প্রথমেই শক্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অবদানের কথা উল্লেখযোগ্য। পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কারের পূর্বে রাসায়নিক বস্তুই শক্তির প্রধানতম উৎস ছিল। এই রাসায়নিক শক্তির উৎসরূপে প্রকৃতিজাত কয়লা ও পেট্রোলিয়ামই প্রধান। পেট্রোলিয়াম ও কয়লা পরিশোধনকালেও জ্বালানী ছাড়াও, অসংখ্য মূল্যবান জৈব-পদার্থ পাওয়া যায় ও তাহা হইতে অন্যান্য শিল্পের উদ্ভব

হয়। কৃত্রিম সংশ্লেষিত, পেট্রোল ও জ্বালানী বহু দেশেই বৃহৎ শিল্পরূপে উদ্ভূত হইয়াছে।

বিভিন্ন জালানী

ধাতুশিল্পও বিজ্ঞানের একটি সুপ্রাচীন ও প্রধানতম অবদান। বিভিন্ন ধাতুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বিশেষ ধাতু-সঙ্করগুলিও, যন্ত্রবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং-এ যুগান্তর আনিয়াছে। ধাতু-সঙ্করের সাহায্যে, লঘুভার, গুরুভার, তাপসহ, ঘাতসহ, ক্ষয় ও মরিচাহীন বহু ধাতবদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে গভীর কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রিতেও বিমানচালক দেখিতে পান কোথায় বিমানঘাঁটি, কোথায় আলো ঘর, কোথায় পাহাড় এবং এই সমস্ত বস্তুর উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়া বিমান ও জাহাজের মধ্যে সহস্র যাত্রীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে পারেন। আবহাওয়াবিদেরা র‍্যাডার যন্ত্রের সাহায্যে নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন বৃষ্টিবহনকারী মেঘ কত উচ্চতায় এবং তাহা হইতেই তাঁহারা আবহাওয়া সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিতে পারেন। শুধু তাহাই নয়, ভূতত্ত্ববিদেরা র‍্যাডারের সাহায্যেই বলিতে পারেন মাটির নিচে ধাতু, মিশ্রিত ধাতু বা তৈলের খনিগুলি কোথায় লুক্কায়িত আছে।

সবশেষে, রাষ্ট্ররক্ষার প্রয়োজনেও বিজ্ঞানের অবদান বিস্ময়কর। অতি বিস্ফোরক ট্রাইনাইট্রোটলুইন, নাইট্রো-সেলুলোজ, নাইট্রোগ্লিসারিন, ডিনামাইট প্রভৃতির বৈজ্ঞানিক বিধ্বংসী ক্রিয়াকে যুদ্ধে মারণাস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। এমনকি বিষবাষ্প, যথা—ফসজিন, ক্লোরিন ইত্যাদি এবং
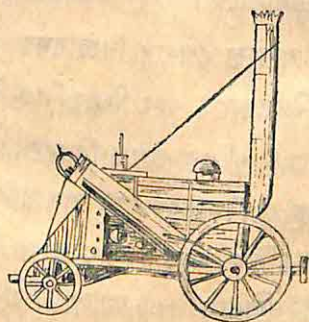
অগ্নিবোমা বা ইনসেন্‌ডিয়ারী বোমায় ফসফরাস ইত্যাদি, গত প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রভূত ব্যবহার করা হইয়াছে। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছে ভয়াবহ মারণাস্ত্র, অ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানে ব্যবহৃত মারাত্মক আণবিক বিস্ফোরণের ধ্বংসাত্মক ঘটনার কথা হয়তো তোমরা শুনিয়াছ।

নানা অবদানে বিজ্ঞানের অতীত ইতিহাস গৌরবময়, বর্তমান—উজ্জ্বল, অলিখিত ভবিষ্যৎ—সম্ভাবনাময়।
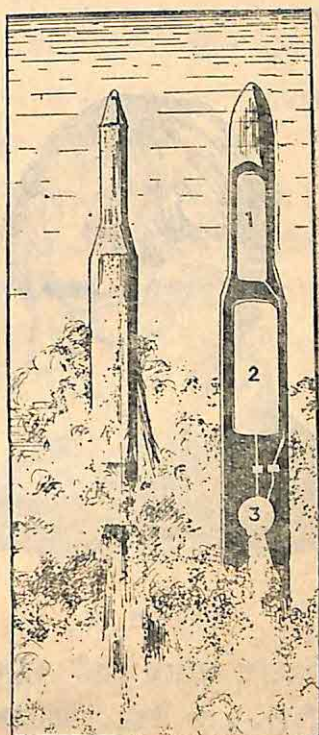
রকেট—বিজ্ঞানের আরেকটি অবদান

১.৮. কয়েকজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক—

জগদীশচন্দ্র বসু

জন্ম :—৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮ খ্রীঃ। মৃত্যু :—২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ খ্রীঃ।

শিক্ষা :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এ. পাশ করেন। কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্‌-সি. উপাধি লাভ করেন, ১৮৯৬ খ্রীঃ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন (১৮৮৫-১৯১৫)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে "এমেরিটাস্ প্রফেসর্" নিযুক্ত হইয়াছিলেন। (১৯১৫)।

কলিকাতার বোস্ রিসার্চ ইন্সষ্টিটিউটের ফাউণ্ডার ডিরেকটর ছিলেন (১৯১৭-১৯৩৭)।

জগদীশচন্দ্র বসু

'নাইট' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন (১৯১৬)।

রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯২০)।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী:—"রেস্পন্‌স্ ইন দি লিভিং এণ্ড নন-লিভিং," "প্ল্যাণ্ট্ রেস্পন্‌স্", "দি মোটর মেক্যানিজম্ অব্ প্ল্যাণ্টস্" ইত্যাদি।

১৮৯৪ গবেষণার ফলে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সৃষ্টির নবতম যন্ত্র তৈয়ারী করিয়া তিনি একটি আলোড়ন আনিয়াছিলেন। ১৮৯৪ নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি পরীক্ষা হইয়াছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ঘরে ঐ বিদ্যুৎ-তরঙ্গ উদ্ভব হইয়াছিল, মধ্যের দরজা বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন তাঁহার নিজের শিক্ষক সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ফাদার লাঁফো। ঘর ভেদ করিয়া পাশের ঘরে একটি পিস্তল ছুঁড়িয়াছিল সেই তরঙ্গ। তাহা ছাড়া তড়িৎ-তরঙ্গের গতি-প্রকৃতির বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের নানাদিক হইতে পরীক্ষা করিয়া তিনি বহু তথ্য নির্ণয় করেন। তাঁহার আবিষ্কারে ঈথর তত্ত্ব (আকাশের দোলা) আরও অগ্রসর হইয়া তারহীন টেলিগ্রাফের প্রারম্ভ সূচিত করিয়াছিল।

১৯১৪—জগতের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানে উদ্ভিদ-জীবন সম্বন্ধে তাঁহার নূতন আবিষ্কার প্রদর্শন ও প্রচারের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট জগদীশচন্দ্রকে চতুর্থবার বিদেশে পাঠাইয়া ছিলেন।

জগদীশচন্দ্রের উদ্ভিদ-বিষয়ক গবেষণা—সব উদ্ভিদেরই মানুষের মত অনুভূতি আছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ভারতকে সভ্য জগতের উচ্চ স্তরে তুলিয়া ধরিবার জন্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যাঁহারা নানাভাবে সাধনা করিয়াছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

জন্ম :—২রা আগস্ট, ১৮৬১ খ্রীঃ। মৃত্যু :—৬ই জুলাই, ১৯৪৪ খ্রীঃ।

শিক্ষা :—১৮৭৯—এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউটে ভর্তি হইলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা পড়িতে যাইতেন। ১৮৮৮—এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস্ সি. ডিগ্রী লাভ করেন। এই সময় তিনি গন্ধক দ্রাবকের সহিত তামা, লোহা ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের পদার্থ মিলিত করিয়া একটি যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করেন। পারদ-ঘটিত যৌগিক পদার্থ মারকিউরাস নাইট্রেট তাঁহারই সৃষ্টি। মাখন, ঘি, চর্বি ইত্যাদির বিশুদ্ধি পরীক্ষার নানা রাসায়নিক উপায়ও আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

১৮৮৯—প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে (১৯১৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালিত অধ্যাপক পদে যোগদান করেন। ১৮৯৩—বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস স্থাপন করেন ও বাঙালীদের ব্যবসায়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

১৯১২—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন।

উপাধি—১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে সি. আই. উপাধি পান। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও ডি. এস-সি. উপাধি পান।

১৯২৪-৪৪—যাদবপুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে ইনি স্বদেশী প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন এবং খদ্দর ও চরকার প্রচারে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী—গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির মুখপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। "হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস" তাঁহার লিখিত একটি অমূল্য গ্রন্থ।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এক রাসায়নিকগোষ্ঠী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ রাসায়নিকগোষ্ঠীর সকলেই ছিলেন তাঁহার প্রিয় ছাত্র—রসিকলাল দত্ত, নীলরতন ধর, প্রিয়দারঞ্জন রায়, পুলিনবিহারী সরকার, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখোপাধ্যায়, সত্যেন বোস, মেঘনাথ সাহা ইত্যাদির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই বৈজ্ঞানিকগোষ্ঠীর সৃষ্টি তাঁহার বিজ্ঞানসাধনার শ্রেষ্ঠ ফল।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সি. ভি. রমন

সি. ভি. রমন

জন্ম :—৭ই নভেম্বর, ১৮৮৮ খ্রীঃ। মৃত্যু :—১৯৭০ খ্রীঃ।

শিক্ষা :—এম. এ., মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯০৭ খ্রীঃ।

১৯১৭-৩৩—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের পালিত অধ্যাপক। ঐ সময় তিনি বিখ্যাত রমন-রশ্মি আবিষ্কার করেন।

রয়েল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হন (১৯২৪)।

সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস (১৯২৮)।

১৯৩৩-৪৩— ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স, বাঙ্গালোর-এর পরিচালক।

১৯৪৩—বাঙ্গালোরে রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের সদস্য (১৯৪৭)। জাতীয় অধ্যাপক। (১৯৪৮)।

উপাধি :—স্যার উপাধি, ১৯২৯ খ্রীঃ।

পদক ও পুরস্কার :—ম্যাটাউরি মেডেল, রোম (১৯২৯), নোবেল পুরস্কার (১৯৩০), হিউজেম মেডেল, রয়েল সোসাইটি (১৯৩০), ফ্রাঙ্কলিন মেডেল, ফিলাডেলফিয়া ইনস্টিটিউট (১৯৫১), ভারতরত্ন (১৯৫৪), লেনিন পুরস্কার (১৯৫৭)।

প্রকাশিত গ্রন্থ :—আলোক, শব্দ, এক্স-রে, কেলাস ইত্যাদির উপর বহু মূল্যবান গ্রন্থ ও প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

মেঘনাদ সাহা

জন্ম :—৬ই অক্টোবর, ১৮৯৩ খ্রীঃ। মৃত্যু :—১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬ খ্রীঃ।

শিক্ষা :—এম. এ., কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ডি. এস্-সি., লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের খয়েরা অধ্যাপক (১৯২১)।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের অধ্যাপক (১৯২৩)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের পালিত অধ্যাপক (১৯৩৮)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক (১৯৫২)।

১৯৫৫-৫৬—কলিকাতায়, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন্ ফর দি কালটিভেসন্ অব সায়েন্স-এর পরিচালক এবং কলিকাতার দি ইনস্টিটিউট অব্ নিউক্লিয়ার ফিজিকস্-এর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

১৯৩৪—সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস।

১৯৩৭-৩৮—সভাপতি, ন্যাসনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স।

১৯৪৯—বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্য।

১৯২৭—ফেলো অব্ দি রয়েল সোসাইটি, ফেলো অব্ দি আমেরিকান অ্যাকাডেমী অব্ দি আর্টস্ এণ্ড সায়েন্স, ফেলো অব্ দি অ্যাসট্রোনোমিকাল সোসাইটিস্ অব অ্যামেরিকান এণ্ড ফ্রান্স।

১৯২৭—ইটালী সরকারের আমন্ত্রণে ইটালী যান। ১৯৪৫—সোভিয়েত বিজ্ঞান পরিষদের উৎসবে যোগদান করেন।

১৯৫২—লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হন।

প্রকাশিত গ্রন্থ :—সৌরমণ্ডলী, তাপ, আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান ইত্যাদি বহু মূল্যবান গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

মেঘনাদ সাহা

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিস

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিস

জন্ম :—২৯শে জুন, ১৮৯৩ খ্রীঃ। মৃত্যু :—২৮শে জুন, ১৯৭২ খ্রীঃ।

শিক্ষা :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি.এস্-সি. (অনার্স) পাশ করেন ১৯১২ খ্রীঃ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. পাশ করেন ১৯১৫ খ্রীঃ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন (১৯১৫)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

ছিলেন (১৯২২)। কলিকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিকাল ইন্স্টিটিউট-এর পরিচালক ছিলেন (১৯৩১)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট স্ট্যাটিস্টিকস্-এর প্রধান ছিলেন (১৯৪৫) এবং কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর ছিলেন (১৯৪৮)।
ভারত সরকারের পরিসংখ্যক উপদেষ্টা (১৯৪৯)।
প্রতিষ্ঠাতা, ও সম্পাদক সাংখ্য, ভারতীয় পরিসংখ্যান পত্রিকা।
১৯৫৫—ভারত সরকারের প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য ছিলেন।
১৯৫০—সভাপতি, ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস।
১৯৫৪—চেয়ারম্যান, ইউ. এন. পরিসংখ্যান কমিশন।
১৯৪৫—ফেলো অব্ দি রয়েল সোসাইটি, ফেলো অব দি কিংস্ কলেজ, কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়।

পদক—ওয়েলডন মেডেল ও পুরস্কার, (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়) সর্বাধিকারী মেডেল, (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) (১৯৫৭), পদ্মবিভূষণ (১৯৬৮)।

সত্যেন্দ্রনাথ বোস

জন্ম :—১লা জানুয়ারি, ১৮৯৪ খ্রীঃ।
মৃত্যু :—৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪।

শিক্ষা :—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এস.-সি. পাশ করেন, ১৯১৫ খ্রীঃ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেক্-চারার ছিলেন (১৯১৬)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার ছিলেন (১৯২১)।

১৯২৪-২৫—ম্যাডাম কুরীর সহকর্মী ছিলেন।

১৯২৫-২৬—তিনি একটি প্রামাণ্য

সত্যেন্দ্রনাথ বোস

তথ্য আবিষ্কার করেন এবং পরে আইনস্টাইনের সহযোগিতায় এই তথ্য সংশোধিত ও পরিমার্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন (১৯২৬)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়েরা অধ্যাপক ছিলেন (১৯৪৫)।

রাজ্যসভার সংসদ্ সদস্য ছিলেন। (১৯৫২)

১৯৫৮—জাতীয় অধ্যাপক ছিলেন।

১৯৪৪—ইণ্ডিয়ান সায়েন্স্ কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন। তিনি ন্যাশন্যাল্ ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস অব ইণ্ডিয়ারও সভাপতি ছিলেন।

১৯৫৮—রয়াল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

পদক :—মেঘনাথ সাহা মেমোরিয়াল স্বর্ণপদক, পদ্মবিভূষণ (১৯৫৮ খ্রীঃ)।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্.-সি. উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলী :—লাইট, কোয়ন্টা, স্ট্যাটিকটিকস্, স্যাফিন, কানেক্‌শন্, কোইফিসিয়েন্টস্ ইত্যাদি।

১.৯. স্থিতি ও গতি (Rest and motion) : এই পৃথিবীর বুকে ঘরবাড়ি, গাছপালা, পাহাড়, পর্বত প্রভৃতিকে স্থির অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে উহারা একই স্থানে সর্বদা স্থির থাকে বলিয়া উহাদের স্থির বলা হয়। আবার নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি যখন চলিতে থাকে, একটি ঘোড়া, একটি বল যখন ছুটিতে থাকে তখন উহাদের গতিশীল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি, ঘোড়া, বল প্রভৃতি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করিতেছে। যে বস্তুকে স্থির দেখি আবার উহাকেই গতিশীল অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। তুমি নিশ্চয়ই রেলে করিয়া কোথাও না কোথাও বেড়াইতে গিয়াছ। সেইখানে হয়ত দেখিয়াছ একটি রেলগাড়ি ১০ মিনিট সময় দাঁড়াইয়া আছে, এক্ষেত্রে রেলগাড়িটি স্থির। আবার ১০ মিনিট পরে গাড়িটি ছাড়িয়া দিল, গাড়িটি ক্রমাগত সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থান পরিবর্তন করিয়া চলিল। এক্ষেত্রে গাড়িটি গতিশীল।

পৃথিবীর বুকে যে সকল বস্তুকে স্থির অবস্থায় দেখা গেল উহারা প্রকৃতপক্ষে

স্থির নহে। কারণ পৃথিবী নিজে স্থির নহে, গতিশীল। পৃথিবী অনবরত নিজ কক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্যকে প্রচণ্ড গতিতে প্রদক্ষিণ করিতেছে। সুতরাং পৃথিবীর উপর অবস্থিত যে সকল বস্তুকে, যেমন, ঘরবাড়ি, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতিকে স্থির বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে উহারা স্থির নহে কারণ উহারাও পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরিতেছে।

পৃথিবী হইতে অন্য কোন গ্রহে যাইয়া পৃথিবীকে দেখা সম্ভবপর হইলে পৃথিবীর পৃষ্ঠে অবস্থিত কোন বস্তুকেই স্থির অবস্থায় দেখা যাইবে না।

বিজ্ঞানীদের মতে যে সূর্যকে পৃথিবী অনবরত প্রদক্ষিণ করিতেছে সেই সূর্যও স্থির নহে অর্থাৎ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সূর্যেরও স্থানের পরিবর্তন ঘটিতেছে। শুধু সূর্য নয়, আকাশের কোনও নক্ষত্রই স্থির নহে। এক কথায় এই মহাবিশ্বে এমন কিছুই নাই যাহা চরম স্থির অবস্থায় রহিয়াছে।

সুতরাং পৃথিবীর বুকে সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবী সাপেক্ষে যে বস্তু স্থির সাধারণতঃ তাহাকেই স্থির বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। যখন কোন বস্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ স্থান পরিবর্তন করে না, তখন উহার অবস্থাকে স্থিতি বলে।

যখন কোন বস্তু সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ স্থান পরিবর্তন করে তখন উহার অবস্থানকে গতি বলে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বায়ু (Air)

২.১. বায়ুর ওজন আছে (Air has weight)ঃ পৃথিবীর চারিদিক বায়ু বা হাওয়ার দ্বারা আবৃত। এই হাওয়া চাদরের মতোই পৃথিবীকে জড়াইয়া আছে। এই বায়ুস্তরকে সঙ্গে লইয়া পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে এবং সূর্যের চারিদিকে অবিরাম ঘুরিতেছে। সুতরাং বলিতে পারি যে, আমরা বায়ুসমুদ্রে বাস করি। কিন্তু জোরে বাতাস না বহিলে আমরা বুঝিতেই পারি না

যে, আমরা বায়ুর মধ্যে বাস করিতেছি। নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সাহায্যেও আমরা বায়ুর অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। বায়ুর জন্যই মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালা বাঁচিয়া আছে। বায়ু একটি গ্যাসীয় পদার্থ। সকল পদার্থেরই ওজন আছে। সুতরাং বায়ুর ওজন আছে। কিন্তু সাধারণ উপায়ে বায়ুর ওজন পাওয়া যায় না। বায়ুর ওজন লইবার জন্য একটি পরীক্ষার বর্ণনা করা হইল।

১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর অটোভন্ গিরীক সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করেন যে, বায়ুর ওজন আছে। ৩ হইতে ৪ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি কাচের গোলাকার পাত্র লওয়া হইল। ইহার মুখে একটি প্যাঁচকলযুক্ত নল লাগানো আছে। একটি বায়ু-নিষ্কাশন যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে প্রায় বায়ুশূন্য করা হইল। প্যাঁচকলের মুখ বন্ধ করিয়া ইহাকে তুলাযন্ত্রের একটি দিকে ঝুলাইয়া ওজন লওয়া হইল। তখন প্যাঁচকলের মুখ খুলিয়া দিলে পাত্রটি বায়ুপূর্ণ হইবে। ইহার ওজনও লওয়া হইল। দুইটি ওজনের পার্থক্য হইতে পাত্রের ভিতরের বায়ুর ওজন পাওয়া যাইবে।
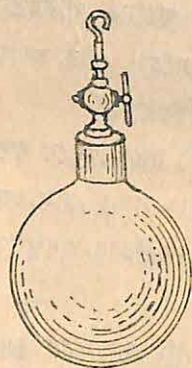
অটোভন্ গিরীক (১৬০২-১৬৮৬) প্রুসিয়ার বৈজ্ঞানিক। গ্যালিলিও, পাস্কাল ও টরিসেলির বায়ুর চাপ সম্বন্ধীয় পরীক্ষাগুলি হইতে উৎসাহিত হইয়া তিনি প্রথম বায়ু-নিষ্কাশন পাম্প প্রস্তুত করেন। তিনি মাগডেবার্গ স্থানের মেয়র ছিলেন। ঐ সময় তিনি মাগডেবার্গ অর্ধগোলক পরীক্ষাটি করেন। তিনি বিভিন্ন তথ্য হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখান যে, ধূমকেতুও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং তাহার সময়কালও নির্ণয় করেন।

২.২. **টরিসেলির জীবনী ঃ** বায়ুচাপের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন ইটালীয়ান বৈজ্ঞানিক টরিসেলি। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ইটালীর অন্তর্গত ফেঞ্জা (Faenza) নামক স্থানে টরিসেলির জন্ম হয়। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিওর ছাত্র ক্যাসটেলির নিকট টরিসেলি ছাত্র হিসাবে ভর্তি হন। সে সময় ক্যাসটেলি তরলের প্রবাহ (Hydro-

dynamics) বিষয়ে গবেষণা করিতেছিলেন। টরিসেলিও তাঁহার নিকট থাকিয়া ঐ বিষয়ে গবেষণা করেন এবং তরলের গতিবিদ্যার উপর একটি সূত্র আবিষ্কার করেন। ইহাকে টরিসেলির নিয়ম বলে। ইহার পর তিনি গ্যালিলিওর তত্ত্বাবধানে গবেষণা করেন। ইহার কিছু পূর্বে আরিস্টটল্ বলেন যে, 'প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না'। গ্যালিলিও ঐ তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া দেখান যে, সিরিঞ্জ বা পাম্প করিয়া যে জল উঠান হয় তাহার কারণ 'প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না'। পাম্পের পিস্টনে টান দিলে ভিতরে শূন্য স্থানের সৃষ্টি হয়। যেহেতু প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না, সেইজন্য বাহিরের বায়ুচাপের জন্য জল পাম্পের ভিতর প্রবেশ করিয়া শূন্যস্থান পূর্ণ করে।

টরিসেলি

১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে বায়ুচাপ সম্বন্ধে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। ইটালীর অন্তর্গত টুস্কানির ডিউক তাঁহার প্রাসাদের উদ্যানে কয়েকটি গভীর কূপ খনন করান। কূপগুলি ৪০ হইতে ৫০ ফুট গভীর। কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য যে পাম্প বসান হইল তাহা প্রায় ৩৪ ফুট পর্যন্ত জল তুলিতে পারিল। ইহাতে বিভ্রান্ত হইয়া ডিউক মহাশয় গ্যালিলিওকে সবিনয়ে এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। গ্যালিলিও ধারণা করেন যে, বায়ুচাপের জন্যই এইরূপ হইতেছে, কিন্তু ইহা প্রমাণ করিবার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। গুরুর মৃত্যুর পর তাঁহার প্রিয় শিষ্য টরিসেলি ইহার সমাধান করেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন যে, যদিও 'প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করে না', তথাপি বায়ুচাপের জন্য জল ৩৪ ফুটের বেশী উঁচুতে উঠিতে পারে না। সুতরাং কূপ ৩৪ ফুটের অধিক গভীর হইলে পাম্পের সাহায্যে জল কূপের মুখ পর্যন্ত উঠিবে না। ১৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে ২৫শে অক্টোবর টরিসেলির অকালমৃত্যু ঘটে।

২.৩. বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) : প্রথমেই বলিয়াছি যে, আমরা

বায়ুসমুদ্রে বাস করি। পৃথিবীর চারিপার্শ্বে পরিব্যাপ্ত এই বায়ুসমুদ্রকে বায়ুমণ্ডল বলে। বায়ু একটি গ্যাসীয় মিশ্রপদার্থ। ভূপৃষ্ঠের নিকটবর্তী অঞ্চলের বায়ু নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড্ ও জলীয় বাষ্পের মিশ্রণ। বায়ুমণ্ডল ঠিক কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। বায়ুকণাগুলি খুব হাল্কা বলিয়া ক্রমশঃ উপরে উঠিতে চেষ্টা করে এবং পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জন্য নীচের দিকে টান অনুভব করে। ফলে পৃথিবীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বায়ু ঘন এবং যতই উপরে উঠা যায়, বায়ু ততই পাতলা হইতে থাকে। আবার যত উপরে উঠা যায়, তাপমাত্রাও তত কমিতে থাকে। প্রায় ৭ মাইল পর্যন্ত বায়ুর তাপমাত্রা ও ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমিতে থাকে। প্রায় ২৫ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুর অস্তিত্ব সঠিকভাবে ধরা যায়।

২.৪. বায়ুমণ্ডলের চাপ (Atmospheric pressure) : এক টুকরা ইট হাতের উপর রাখিয়া হাত সোজা করিয়া ধরিলে হাতের উপর চাপ পড়ে। ইহার কারণ ইটের ওজন আছে। অতএব বলা যায় যে, যাহারই ওজন আছে, তাহাই চাপ দিতে পারে। এখন আমরা জানি যে, বায়ুর ওজন আছে, সুতরাং বায়ুর চাপ আছে। বায়ু খুব হাল্কা বলিয়া মনে হয় যে, বায়ুর চাপ সামান্য। কিন্তু সমগ্র বায়ুমণ্ডলকে ধরিলে, এই চাপ সামান্য নহে। সমস্ত বায়ুমণ্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করিলে বোঝা যায় যে, সব উপরের স্তর, তাহার নীচের স্তরের উপর চাপ দেয়। এই দুইটি স্তরের ওজন, তৃতীয় স্তরের উপর চাপ দেয়। তিনটি স্তরের ওজন চতুর্থটির উপর চাপ দেয়। এইরূপে সমগ্র বায়ুমণ্ডলের জন্য ভূপৃষ্ঠের উপর চাপ পড়ে। এই চাপকে বায়ুমণ্ডলের চাপ বলে। দেখা গিয়াছে যে, এক বর্গ ইঞ্চি পরিমিত স্থানে বায়ুমণ্ডলের চাপ প্রায় ১৫ পাউণ্ড বা ৬.৮ কেজি। একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের উচ্চতা ৬ ফুট বা ১.৮ মিঃ হইলে, তাহার শরীরের উপর মোট বায়ুচাপ পড়ে প্রায় ১৫২০০ কেজি। এই বিরাট চাপ সত্ত্বেও একজন মানুষ বেশ সহজ-ভাবেই চলাফেরা করিতে পারে। অথচ সামান্য ১০ কেজি ওজন লইয়া আমরা হাঁটিতে কষ্ট অনুভব করি। ইহার কারণ এই যে, আমাদের শরীরের

মধ্যেও বায়ু আছে। শরীরের ভিতরের বায়ুর চাপ এবং রক্তের চাপ একযোগে বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপকে প্রতিরোধ করে। সেইজন্য কষ্ট অনুভব হয় না।

বায়ুমণ্ডলের চাপের সংজ্ঞা : ভূপৃষ্ঠের উপর এক বর্গইঞ্চি পরিমিত স্থানে একটি খাড়া স্তম্ভ কল্পনা করিলে, সেই স্তম্ভের মধ্যস্থ সমস্ত বায়ুর যাহা ওজন, তাহাই ঐ স্থানের বায়ুমণ্ডলের চাপ।

২.৫. বায়ুচাপের অস্তিত্ব (Existence of atmospheric pressure) : আমরা দেখিয়াছি যে, বায়ুচাপের অস্তিত্ব সহজে বোঝা যায় না। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, বায়ু সর্বদিকে সমানভাবে চাপ দেয়। বায়ুর পার্শ্বচাপ, উর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপের নিম্নে কয়েকটি পরীক্ষা দেওয়া হইল—
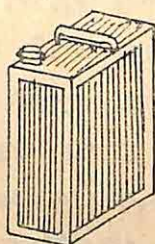
(১) একটি কাচের গ্লাস কানায় কানায় জল দিয়া ভর্তি করা হইল। একটি কার্ড দ্বারা গ্লাসের মুখ চাপা দেওয়া হইল। হাত দিয়া কার্ডটি চাপিয়া ধরিয়া গ্লাসটি উপুড় করা হইল। এখন হাত সরাইয়া লইলে দেখা যাইবে কার্ড বা জল কিছুই পড়িবে না। বায়ুর উর্ধ্বচাপের জন্যই ইহা সম্ভব।

(২) একটি পেট্রল বা ফ্লিটের টিনে কিছু জল লইয়া উনানে বা বার্নারের সাহায্যে বেশ কিছুক্ষণ ফুটান হইল। জল ফুটাইবার ফলে বাষ্প নির্গত হইয়া ভিতরের সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া দিবে। এখন উনান হইতে টিনটি সরাইয়া আনিয়া ইহার মুখ প্যাঁচযুক্ত ছিপি দ্বারা বন্ধ করা হইল। পাত্র যত ঠাণ্ডা হইবে ভিতরের বাষ্প তত জমিয়া জল হইবে। ভিতরের বায়ুর চাপ কমিয়া

যাওয়ায় বাহিরের বায়ুর চাপে পাত্রটি বাঁকিয়া, দুমড়াইয়া যাইবে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, বায়ু সর্বদিকে চাপ দেয়।

(৩) **অটোভন গিরীকের মাগডেবার্গ অর্ধগোলক পরীক্ষা:** ১৬৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রুশিয়ার সম্রাট ফার্ডিনাণ্ড III-এর রেজেন্সবার্গ সভায় বৈজ্ঞানিক অটোভন গিরীক এই পরীক্ষাটি করেন। তিনি ২২ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দুইটি তামার অর্ধগোলক A ও B লইয়াছিলেন। ইহাদের জুড়িয়া একটি পূর্ণগোলক করা যায়। দুই অর্ধগোলকের সংযোগস্থলে একটি চামড়ার পটি, তেল ও মোমে ভিজাইয়া লাগান হয় যাহাতে গোলকটি বায়ু-নিরুদ্ধ হয়। একটি গোলকে একটি প্যাঁচকলযুক্ত নল C লাগানো আছে। এই নল দ্বারা বায়ু-নিষ্কাশন পাম্পের সাহায্যে সমস্ত বায়ু বাহির করিয়া লওয়া হইল। দুই দিকে D_1 ও D_2-তে আটটি করিয়া ঘোড়া বাঁধিয়া টান দিলেও অর্ধগোলক দুইটি খুলিবে না। গোলকের ভিতরে বায়ু নাই। কিন্তু বাহিরে চারিপার্শ্বে বায়ুমণ্ডলের চাপের জন্য গোলক দুইটি খুলিবে না। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই গোলকের চারিপার্শ্বে বায়ুর চাপ প্রায় ৩ টন।
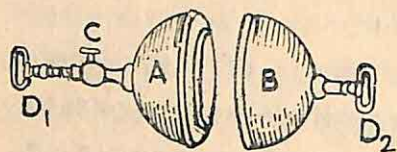
২.৬. টরিসেলির পরীক্ষা (Torricelli's experiment) ও সাধারণ বায়ুচাপমান যন্ত্র (Simple Barometer): একটি দুই মুখ খোলা নলের একটি মুখ কোন তরলে ডুবাইয়া, অপর দিক হইতে বায়ু টানিয়া লইলে দেখা যায় যে, নলের মধ্যে তরল উপরে উঠিয়া যায়। বায়ু টানিয়া লইলে যে শূন্য স্থান হয়, তরল সেই শূন্য স্থান পূর্ণ করে। টরিসেলিই সর্বপ্রথম

পরীক্ষা করিয়া দেখান যে, নলের মধ্যে জল ৩৪ ফুট বা ১০.৩ মিটার উঠিতে পারে। কারণ বায়ুমণ্ডলের চাপের জন্য জল ৩৪ ফুটের অধিক উঠিতে পারে না। তিনি আরও বলেন যে, হাল্কা তরল যেমন বেশী উঁচুতে উঠিবে, সেইরূপ কোন ঘন ও ভারী তরল কম উঠিবে। যেহেতু পারদ জল অপেক্ষা ১৩.৬ গুণ ভারী, সুতরাং নলের মধ্যে পারদ উঠিবে মাত্র ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬ সে. মি.। ইহার উপর ভিত্তি করিয়া টরিসেলি, তাঁহার ছাত্র ভিভিয়ানির সহযোগে সর্বপ্রথম বায়ুচাপমান যন্ত্র বা ব্যারোমিটার প্রস্তুত করেন। এই পরীক্ষাকে টরিসেলির পরীক্ষা বলে।

টরিসেলির পরীক্ষা: এক মুখ বন্ধ প্রায় ১ মিটার দীর্ঘ একটি মোটা কাচের নল বিশুদ্ধ ও শুষ্ক পারদ দ্বারা পূর্ণ করা হইল। পরে ঐ খোলা মুখ বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা বন্ধ করিয়া নলটিকে খাড়াভাবে ধরিয়া, ইহার খোলা মুখ একটি পারদপূর্ণ পাত্রে ডুবাইয়া আঙুল সরাইয়া লওয়া হইল। দেখা যাইবে যে, পারদ নলের মধ্যে কিছুটা নামিয়া আসিয়া একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। পাত্রের পারদতল হইতে নলের পারদতল পর্যন্ত উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি বা ৭৬ সে. মি. হইবে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যে, নলের মধ্যে পারদস্তম্ভ নিজে নিজেই খাড়া-

ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু তাহা সম্ভবও নয়, সত্যও নয়, বায়ুমণ্ডলের চাপই ইহার জন্য দায়ী। বাহিরের বায়ু পাত্রের উন্মুক্ত পারদের উপর চাপ

দিতেছে। এই চাপ নলের মধ্যে পারদে সঞ্চালিত হয়। নলের মধ্যে, বাহিরের পারদতলের সহিত এক সমতলে মোট চাপ সমান। বাহিরের তলে চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের সমান এবং ভিতরের তলে চাপ পারদস্তম্ভের ওজনের সমান। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, বায়ুমণ্ডলের চাপ পারদস্তম্ভকে ধরিয়া আছে। সুতরাং পারদস্তম্ভের উচ্চতা জানা থাকিলে বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করা যায়।

পারদস্তম্ভের উপরে নলের বন্ধ প্রান্ত পর্যন্ত স্থান সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য। ইহাকে **টরিসেলির শূন্য স্থান** বলে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ শূন্য নহে। ইহাতে অতি সামান্য পারদ বাষ্প থাকে।

টরিসেলির পরীক্ষা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি বিষয়ে জানিবার আছে।

(i) যদি নলটির গায়ে যে কোন স্থানে একটি ছিদ্র থাকে, তাহা হইলে সেই ছিদ্রপথে বায়ু প্রবেশ করিয়া পারদস্তম্ভের উপর চাপ দিবে, ফলে সমস্ত পারদ পাত্রে আসিয়া জমিবে। কারণ পারদস্তম্ভের উপরে বায়ুর চাপ এবং নীচে বায়ুর চাপ সমান।
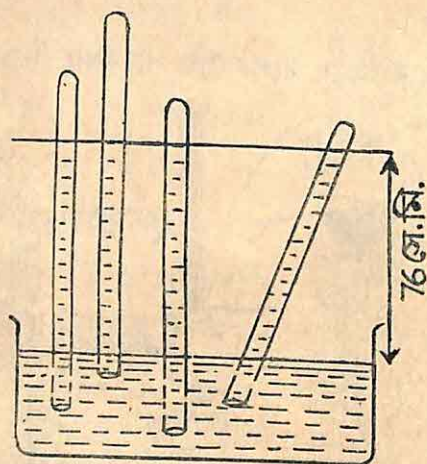
(ii) নলটির খোলা মুখ পারদে ডুবানো অবস্থায়, যদি নলটিকে ধীরে ধীরে উপরে উঠান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে পারদস্তম্ভের উচ্চতা একই থাকিবে, কিন্তু পারদস্তম্ভের উপরের শূন্য স্থানের আয়তন বৃদ্ধি পাইবে।

আবার নলটিকে যদি ধীরে ধীরে পারদের মধ্যে বেশী করিয়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেও পারদস্তম্ভের উচ্চতা সমান থাকিবে, কিন্তু শূন্য স্থানের আয়তন কমিয়া যাইবে। অবশেষে এমন সময় আসিবে যখন পারদস্তম্ভের উপরের তল, নলের বদ্ধ মুখে ঠেকিয়া যাইবে এবং একটি ধাতব শব্দের উৎপত্তি হইবে।

(iii) নলটির খোলা মুখ পারদে ডুবানো অবস্থায় যদি নলটিকে ক্রমশঃ হেলান যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, পারদস্তম্ভের খাড়া উচ্চতা সমান থাকিবে এবং অবশেষে পারদস্তম্ভ নলটির বদ্ধ মুখে ঠেকিয়া যাইবে।

(iv) নলটির শূন্য স্থানে একটি বাঁকানো নলের সাহায্যে যদি সামান্য বায়ু বা জল প্রবেশ করান যায়, তাহা হইলে বায়ু বা উৎপন্ন জলীয় বাষ্প পারদস্তম্ভের উপর চাপ দিবে। ফলে পারদস্তম্ভ কিছুটা নামিয়া আসিবে। পারদস্তম্ভের দুই বারের উচ্চতার পার্থক্য হইতে আবদ্ধ বায়ু বা জলীয় বাষ্পের চাপ পাওয়া যাইবে।

ব্যারোমিটারের মূল নীতি: টরিসেলির পরীক্ষা হইতে দেখা যায় যে, বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপের জন্য নলে পারদস্তম্ভ দাঁড়াইয়া থাকে। অতএব পারদস্তম্ভের উচ্চতা মাপিয়া, বায়ুমণ্ডলের চাপ পরিমাপ করা যায়। পাত্রের পারদতল হইতে একটি মিটার স্কেল খাড়াভাবে ধরিয়া নলের মধ্যে পারদের অবস্থান, স্কেলে পাঠ লইলেই বায়ুমণ্ডলের চাপ পাওয়া যাইবে। কিন্তু কোনদিন বায়ুর চাপ কমিয়া যাইলে পারদস্তম্ভের উচ্চতাও কম হইবে, ফলে পাত্রে পারদ তল কিছুটা উঠিয়া যাইবে। সুতরাং স্কেলটিকেও সামান্য উঠাইতে হইবে। আবার যেদিন বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাইবে, সেইদিন পারদস্তম্ভের উচ্চতা বাড়িবে এবং পাত্রের পারদতল কিছুটা নামিয়া যাইবে। ফলে স্কেলটিকেও নামাইতে হইবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য ফোরটিন ব্যারোমিটার (Fortin's Barometer) প্রস্তুত হয়। ইহাতে নলের গাত্রে স্কেলের অংশাঙ্কন করা হয়। অতএব স্কেল স্থির থাকে। কিন্তু পারদপূর্ণ পাত্রটির তলদেশ চামড়ার তৈয়ারী করা হয় এবং একটি স্ক্রু সাহায্যে চামড়া ঠেলিয়া দিলেই পারদতলও উঠিয়া যাইবে এবং স্কেলের 0-দাগে স্থির থাকিবে। ইহার পর নলের মধ্যে

পারদের অবস্থান স্কেল হইতে পাঠ লওয়া হয়। ইহাই ব্যারোমিটারের মূল নীতি।

২.৭. বায়ুর উপাদান (Composition of Air) : আমাদের পৃথিবীর চারিদিকে একটি গ্যাসীয় আবরণ আছে, ইহাকেই বায়ুমণ্ডল বলা হয়। প্রাচীন হিন্দুগণ বায়ুকে একটি মৌল মনে করিতেন; গ্রীক বৈজ্ঞানিকগণও উহাকে মৌলিক পদার্থ হিসাবেই গণ্য করিতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শীলে, প্রিস্ট্লী ও ল্যাভয়সিয়রের বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা যায়, বায়ুর একটি অংশ বিভিন্ন দহনক্রিয়ায় এবং প্রাণীদের শ্বাসকার্যে অংশ গ্রহণ করে, অপরটি করে না। অর্থাৎ বায়ু অন্ততঃ দুইটি পদার্থের মিশ্রণ।

বায়ু মুখ্যতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন এই দুইটি মৌলিক পদার্থের মিশ্রণ। ইহাদের সহিত স্বল্প পরিমাণে কার্বন ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, নিষ্ক্রিয় গ্যাস প্রভৃতি মিশ্রিত আছে।

এতদ্ব্যতীত বায়ুতে সামান্য নাইট্রিক অ্যাসিড বাষ্প, ওজোন এবং প্রচুর সূক্ষ্ম ধূলিকণা বর্তমান। বিশুদ্ধ বায়ুতে উপাদানসমূহের অনুপাত সাধারণতঃ এইরূপ দেখা যায়—

	ওজন	আয়তন
নাইট্রোজেন	৭৫·৫%	৭৮·১১%
অক্সিজেন	২৩·২%	২০·৯৬%
নিষ্ক্রিয় গ্যাস	১·৩%	·৯৩%
	১০০·০০	১০০·০০

বলা বাহুল্য, এই উপাদানগুলির অনুপাত সর্বদা এক হয় না। স্থান-কাল-ভেদে এই অনুপাত পরিবর্তনশীল।

২.৮. পদার্থের শ্রেণী বিভাগ : পৃথিবীতে পদার্থের সংখ্যা অগণিত। এই সকল পদার্থের কতকগুলি নিজস্ব ধর্ম আছে। পদার্থের শ্রেণী বিভাগ করিতে হইলে উহাদের উপাদানের কথাই ভাবিতে হইবে। অনেক পদার্থেই দুই বা ততোধিক বস্তু একত্রে মিশ্রিত থাকে। একটি মাত্র উপাদানে গঠিত পদার্থগুলিকে বিশুদ্ধ পদার্থ বলে। পরীক্ষা ও নিরীক্ষার সুবিধার জন্য

বিশুদ্ধ পদার্থগুলিকে বৈজ্ঞানিকগণ দুই শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছেন ঃ (১) মৌলিক পদার্থ (Element), (২) যৌগিক পদার্থ (Compound)।

যে সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে নতুন ধর্মবিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থ প্রস্তুত হয় না, তাহাদিগকে মৌলিক পদার্থ বা মৌল বলে। যেমন স্বর্ণ, লৌহ, গন্ধক, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন প্রভৃতি। পৃথিবীতে মৌলের সংখ্যা বর্তমানে ১০৫। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৯০টি মৌল প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। বাকিগুলি প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। পরমাণু বিজ্ঞানীরা নেপচুনিয়াম, প্লুটোনিয়াম ইত্যাদি দশটির অধিক মৌলিক পদার্থ তৈয়ারী করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মানুষের দেহেও অনেকগুলি মৌল আছে। বিজ্ঞানীদের মতে মানুষের দেহে ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, লৌহ, আইয়োডিন, কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি মৌলিক পদার্থ বর্তমান।

যে সকল পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে দুই বা ততোধিক সরল বা মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহাদিগকে যৌগিক পদার্থ বলে।

প্রকৃতিতে অগণিত যৌগিক পদার্থ আছে এবং বিজ্ঞানীরা তাঁহাদের পরীক্ষাগারে প্রতিদিন নানারকম মৌলিক পদার্থকে রাসায়নিকভাবে যুক্ত করিয়া নূতন নূতন যৌগিক পদার্থ গঠন করিতেছেন।

উদাহরণ ঃ জল, চিনি, খাদ্য-লবণ, সাবান, তেল ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ।

চিনিকে বিশ্লেষণ করিলে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও কার্বন পাওয়া যায়। বিদ্যুৎপ্রবাহ জলকে বিশ্লেষণ করে ; ফলে দুইটি মৌলিক পদার্থ, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থের মিলনেই যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়। এই মিলন শুধুমাত্র সংমিশ্রণ নয় ; ইহাতে মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে গভীরতর রাসায়নিক সংযোগ থাকে। সেইজন্য যৌগিক পদার্থের মধ্যে অবস্থিত উপাদানগুলি অর্থাৎ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলিকে সহজে পৃথক করা যায় না।

মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের তুলনা

মৌলিক পদার্থ	যৌগিক পদার্থ
১। কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় থাকে।	১। কঠিন, তরল ও বায়বীয় অবস্থায় থাকে।
২। ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভাজন করিলেও পদার্থের গুণাবলীর কোন পরিবর্তন হয় না।	২। বিভাজন করিলে ক্ষুদ্রতর মৌলিক পদার্থে বিভক্ত হয় যাহাদের গুণাবলী পূর্বেকার পদার্থ হইতে ভিন্ন।
৩। মৌলিক পদার্থের সংখ্যা পৃথিবীতে কম।	৩। যৌগিক পদার্থের সংখ্যা অসংখ্য।
৪। ক্ষুদ্রতম কণাকে পরমাণু বলে।	৪। ক্ষুদ্রতম কণাকে অণু বলে। অণু বিভক্ত করিলে দুই বা ততোধিক পরমাণু পাওয়া যায়।
৫। কয়েকটি একাধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়।	৫। একটি যৌগিক পদার্থের বিভাজনে দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায়।

২.৯. **মিশ্র পদার্থ (Mechanical mixture) :** দুই বা ততোধিক পদার্থ বিভিন্ন অনুপাতে একত্রে মিশ্রিত থাকিলে, সেই মিশ্রণকে মিশ্র পদার্থ বলে। মিশ্র পদার্থ হইতে উপাদানগুলিকে সহজেই পৃথক করা হয়।

পরিস্রাবণ (Filtration) : যে প্রক্রিয়ায়, তরল পদার্থকে তাহার মধ্যস্থ কঠিন অদ্রাব্য পদার্থসমূহ হইতে বিমুক্ত করা চলে, তাহাকে পরিস্রাবণ বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায়, অন্যান্য প্রক্রিয়া অপেক্ষা পৃথকীকরণ আরও সম্পূর্ণভাবে ঘটিয়া থাকে ; এবং অতি সূক্ষ্ম কণিকা ছাড়া ভারী ও লঘু, উভয় প্রকার অদ্রাব্য কঠিন পদার্থই বিমুক্ত হয়।

পরীক্ষা : পরীক্ষাগারে পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার জন্য প্রথমে একটি কাচের ফানেল লওয়া হয়। একটি গোলাকার ফিল্টার কাগজকে ভাঁজ করিয়া,

কোণাকৃতি করিয়া ঐ ফানেলের মধ্যে বসাইয়া একটি কাচদণ্ডের সাহায্যে তরল পদার্থটিকে ফিল্টার কাগজের উপরে ঢালা হয়। পরিস্থত তরল পদার্থ ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া আসে, ইহাকে পরিস্রুত বলা হয়। যে অদ্রাব্য কঠিন পদার্থ ফিল্টার কাগজের উপর থাকিয়া যায় উহাই অবশেষ।
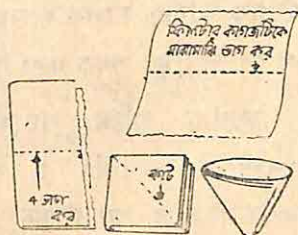
থিতান (Sedimentation): যে প্রক্রিয়ায় একটি ভারী অদ্রাব্য কঠিন পদার্থকে মিশ্রিত তরল পদার্থ হইতে অন্তঃক্ষেপরূপে তরল পদার্থের নিম্নাংশে জমিতে দেওয়া হয়—সেই প্রক্রিয়াকে থিতান বলা হয় এবং অন্তঃক্ষেপকে স্থানচ্যুত না করিয়া, যে প্রক্রিয়ায় উপরিস্থ তরল অংশকে পৃথক করা হয়, সেই প্রক্রিয়াকে আস্রাবণ (decantation) বলা হয়।

কেলাসন (Crystallization): উচ্চতর উষ্ণতায় প্রস্তুত একটি পদার্থের সংপৃক্ত দ্রবণকে শীতল করিলে প্রায়ই দেখা যায় যে, দ্রবণ-মধ্যস্থ কঠিনের কিছু অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুষম ও নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারের বস্তুকণারূপে পৃথক হইয়া আছে। এই বস্তুকণাগুলিকে কেলাস ও প্রক্রিয়াটিকে কেলাসন বলে।

২.১০. চুম্বকের সাহায্যে সাধারণ মিশ্রণের উপাদানগুলির পৃথকী-

করণ: লৌহ এবং গন্ধক-চূর্ণের মিশ্র Separation by magnet হইতে
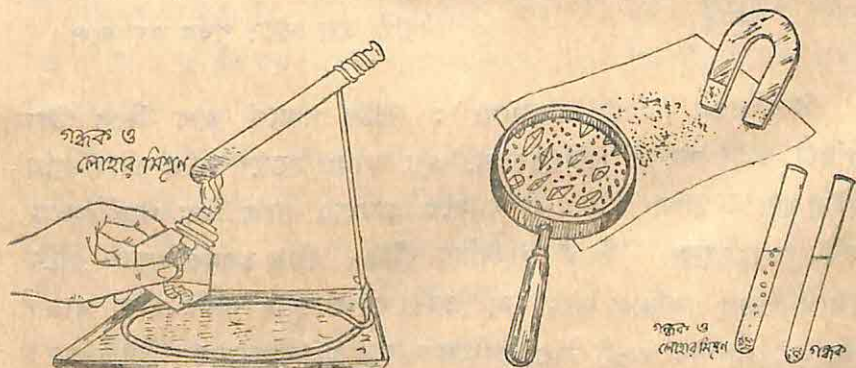
লৌহকে চুম্বকের সাহায্যে অথবা গন্ধককে কার্বন ডাই-সালফাইডের সাহায্যে পৃথক করা চলে ; এই দুই প্রক্রিয়াই যান্ত্রিক। কিন্তু লৌহ ও গন্ধক-চূর্ণ ইহাদের যৌগিক আয়রণ সালফাইডের মধ্যে বর্তমান থাকিলেও, এইরূপ কোন যান্ত্রিক উপায়ে উহাদের পৃথক করা যায় না।

অদ্রাব্য কঠিন পদার্থসমূহের পৃথকীকরণ (Separation of insoluble solids) : অল্প পরিমাণ কাদা, জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া একটি বীকারে আলোড়ন করা হইল এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া দেওয়া হইল। দেখা যাইবে পাত্রটির তলায় কলক বা অন্তঃক্ষেপ থিতাইয়া জমে ও উপরিস্থিত তরল অংশ প্রায় স্বচ্ছ হইয়া আসে। কাদার মধ্যের অদ্রাব্য পদার্থসমূহ পৃথক হইবার ফলেই অন্তঃক্ষেপ জমে। অন্তঃক্ষেপটিকে বিচলিত না করিয়া, উপরের স্বচ্ছ তরলাংশটিকে সতর্কভাবে আরেকটি পাত্রে ঢালিয়া লওয়া যায়। এই পরীক্ষা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় :—
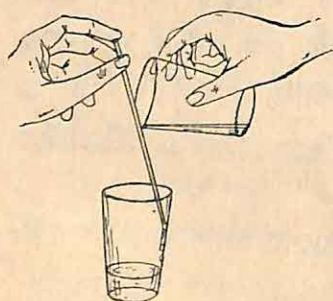
(১) কাদার মধ্যে জলে অদ্রাব্য এরূপ কতকগুলি পদার্থ আছে।

(২) অদ্রাব্য পদার্থগুলি জল অপেক্ষা ভারী বলিয়া তলায় জমে।

(৩) সরল প্রক্রিয়ায় তাহাদের কর্দমাক্ত জল হইতে পৃথক করা চলে।

উর্ধ্বপাতন (Sublimation) : কঠিন পদার্থে তাপ দিলে উহা গলিয়া তরল পদার্থে পরিণত হয়, এবং আরও উত্তাপে তরল পদার্থ গ্যাস হইয়া যায়। ঠাণ্ডা করিয়া ঐ গ্যাসকে প্রথমতঃ তরল এবং পরে উহাকে কঠিন করা সম্ভব। ইহাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু কখনও কখনও কঠিন বস্তুকে উত্তপ্ত করিলে তরল না হইয়া সোজাসুজি গ্যাস হইয়া যায়। এবং এই গ্যাসীয় বস্তুটি ঠাণ্ডা করিলে আবার কঠিন অবস্থায় পরিণত হয়। উত্তাপে পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে একেবারে বাষ্পে পরিণতি এবং

শৈত্যে বাষ্প হইতে সরাসরি কঠিন অবস্থায় প্রত্যাবর্তনকে উর্ধ্বপাতন বলে। এই জাতীয় রূপান্তরে পদার্থটির রাসায়নিক সংযুতি অক্ষুণ্ণ থাকা প্রয়োজন। আয়োডিন, নিশাদল, কর্পূর প্রভৃতি এইরূপ ব্যবহার করে। উহাদের গরম করিলে গলিবে না, কিন্তু বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাইবে।

পরীক্ষা: একটি পরীক্ষা নলে কিছুটা কর্পূর লও আর উহাকে দীপের সাহায্যে উত্তপ্ত কর ; পরীক্ষা নলের উপর আর একটি পরীক্ষা নল বসাইয়া রাখ, উত্তাপ দিলে কর্পূর প্রথমে বাষ্পীভূত হইবে এবং পরে উহা পরীক্ষা নলের ঠাণ্ডা অংশে আসিয়া লাগিলেই কঠিন আকারে সঞ্চিত হইবে। অনেক সময় উর্ধ্বপাতনের সাহায্যে মিশ্র পদার্থের উপাদান পৃথক করা সম্ভব হয়। যেমন, যদি আয়োডিন ও বালু একত্র মিশ্রিত থাকে তবে উর্ধ্বপাতন দ্বারা আয়োডিন সরাইয়া আনা যাইবে এবং বালু পড়িয়া থাকিবে।
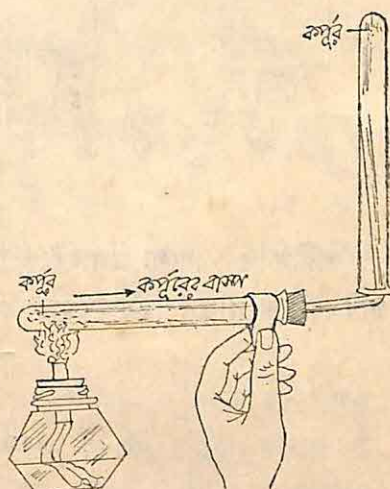
যে সমস্ত তরল বা কঠিন পদার্থ সহজে বাষ্পে পরিণত হয়, যেমন, জল, স্পিরিট, কর্পূর ইত্যাদি, তাহাদের উদ্বায়ী বস্তু বলা হয়। এবং যে সকল বস্তু সহজে বাষ্পীভূত হয় না, যেমন, কাঠ, লবণ, পারদ ইত্যাদি, তাহাদিগকে অনুদ্বায়ী বস্তু বলে।

পাতন (Distillation): তরল পদার্থকে উত্তাপের সাহায্যে বাষ্পীভূত করা এবং সেই বাষ্পকে শীতল করিয়া আবার তরল অবস্থায় ফিরাইয়া আনাকে পাতন প্রণালী বলে। সুতরাং পাতন প্রণালী বাষ্পীকরণ এবং ঘনীকরণ এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয়। ল্যাবরেটরীতে পাতন প্রণালীর প্রয়োগ খুবই সাধারণ এবং তরল পদার্থকে বিশুদ্ধ করিতে পাতনের সাহায্য অপরিহার্য। তরল পদার্থের সঙ্গে যখন অদ্রবণীয় পদার্থ মিশ্রিত থাকে, তখন পরিস্রুতির দ্বারা

উহাদের পৃথক করা যায়। কিন্তু কোন পদার্থ যদি তরল পদার্থে দ্রবীভূত থাকে তাহা হইলে পরিস্রাবিত করিয়া তাহাদের পৃথক করা সম্ভব নয়। তখন পাতনের সাহায্য লইতে হয়। নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা পাতনের উপযোগিতা সম্যক উপলব্ধি হইবে।

পাতনের সাহায্যে চিনির জল হইতে চিনি ও জলকে পৃথক করা যায়। শুধু তাহাই নয়, পেট্রোল ও জলের মিশ্রণ হইতে পেট্রোলকে পৃথক করা যায়।

পরীক্ষা ঃ ঘোলা জল হইতে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করিতে পার। নিজেই ছবি দেখিয়া পাতন যন্ত্রটি তৈয়ারী করিয়া লইতে পার।
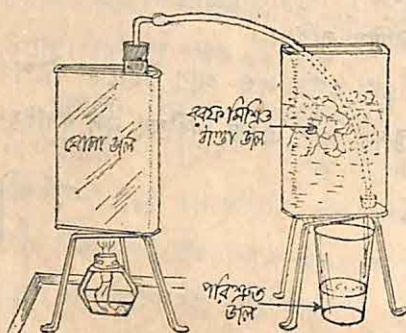
তৃতীয় অধ্যায়

জল (Water)

৩.১. তরলের চাপ (Liquid Pressure) ঃ তরলের নিজস্ব কোন আকার নাই। ইহাকে যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রের আকার ধারণ করে। তরলের নিজস্ব কয়েকটি ধর্ম আছে। তরলের সংনম্যতা (Compressibility), ঘর্ষণ (friction) থাকে না। নিজস্ব আকার থাকে না, কিন্তু আয়তন থাকে। তরলের এই সব গুণ অবলম্বন করিয়া উদস্থৈতিক বিদ্যা প্রস্তুত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক প্যাস্কাল, আর্কিমিডিস্ এই বিদ্যার উপর গবেষণা করেন।

তরলকে যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের গায়ে তরল চাপ প্রদান করে। একটি সচ্ছিদ্র পাত্রে তরল রাখিলে দেখা যায় যে, ছিদ্র দিয়া তরল বেগে বাহির হইয়া আসিতেছে। একটি টিনের চাকতি ঐ ছিদ্রমুখে চাপিয়া ধরিলে তরলের প্রবাহ বন্ধ হইবে। অতএব দেখা যায় যে, পাত্রের ভিতরের তরল চাপ দিয়া ছিদ্র মুখ দিয়া বাহির হইতেছিল এবং বাহির হইতে চাকতিটি বলপ্রয়োগে ধরিয়া রাখিয়া তরলের ঐ চাপকে প্রতিহত করা হইতেছে।
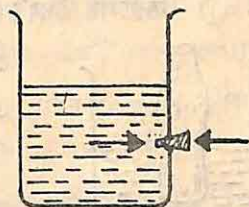
তরলের চাপের সংজ্ঞা : তরলের মধ্যে কোন বিন্দুতে চাপ বলিতে আমরা বুঝি ঐ বিন্দুকে ঘিরিয়া একটি একক ক্ষেত্রফলের উপর তরল মোট যে চাপ দেয়। ঐ বিন্দুর চতুর্দিকে ঘিরিয়া একক ক্ষেত্রফলের উপর তরলের উপরিতল পর্যন্ত একটি উল্লম্ব চোঙের মধ্যস্থ তরলের মোট ওজনকে ঐ বিন্দুতে তরলের চাপ বলে।
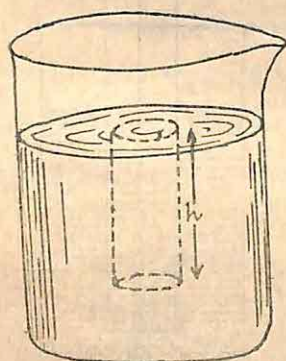
যদি তরলের অভ্যন্তরে O বিন্দুতে চাপ P হয় এবং O বিন্দুর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থলের ক্ষেত্রফল A হয়, তাহা হইলে ঐ ক্ষেত্রফলের উপর তরল মোট যে বলপ্রয়োগ করিবে তাহাকে তরলের ঘাত বলে।

∴ তরলের ঘাত (Thrust) = তরলের চাপ × ক্ষেত্রফল

বা, $F = P.A$

অতএব $P = \frac{F}{A}$ বা, চাপ $= \frac{\text{ঘাত}}{\text{ক্ষেত্রফল}}$

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে চাপের একক ডাইন প্রতি বর্গ সে. মি.।

এবং এফ. পি. এস্. পদ্ধতিতে চাপের একক পাউণ্ডাল প্রতি বর্গফুট।

৩.২. **তরলের চাপ সম্বন্ধীয় পরীক্ষা** (Experiments on liquid pressure) : তরল যে পাত্রে রাখা হয় সেই পাত্রের গায়ে চাপ দেয়।

তরলের ঊর্ধ্বচাপ, নিম্নচাপ, পার্শ্বচাপ আছে। বিভিন্ন পরীক্ষা দ্বারা এই চাপ প্রমাণ করা যায়।

(i) তরলের ঊর্ধ্বচাপ (Upward pressure): একটি খালি বোতল খোলা মুখ উপরের দিকে রাখিয়া খাড়াভাবে একটি জলপূর্ণ পাত্রে চাপিয়া ধরিয়া রাখিলে বোতল স্থির থাকে। কিন্তু বোতল ছাড়িয়া দিলেই লাফাইয়া উঠিবে। বোতলের তলদেশে জলের ঊর্ধ্বচাপের জন্যই এরূপ হয়।
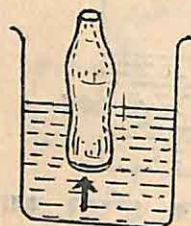
পরীক্ষাগারে তরলের ঊর্ধ্বচাপ প্রমাণ করিবার জন্য একটি জলপূর্ণ পাত্র লওয়া হইল। দুই মুখ খোলা একটি নল এবং নলের মুখের অপেক্ষা কিছু বড় একটি টিনের চাকতি লওয়া হইল। চাকতির উপরে একটি আংটা আটকানো আছে। আংটার সহিত একটি সূতা বাঁধা আছে। টিনের চাকতিটি নলের একটি খোলা মুখে সূতা ধরিয়া টান দিলে চাকতিটি নলের মুখে নিশ্ছিদ্র-ভাবে আটকাইয়া যাইবে। সূতা ধরিয়া নলটিকে জলের মধ্যে কিছুটা ডুবাইয়া সূতা ছাড়িয়া দিলে চাকতিটি পড়িবে না। চাকতি-টির নীচের দিকে জল ঊর্ধ্বচাপ দেয়, সেজন্য চাকতিটি পড়িতেছে না। এখন নলের অপর মুখ দিয়া নলের মধ্যে জল ঢালা হইল। ভিতরে জলের তল ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে যে মুহূর্তে ভিতরের ও বাহিরের জলতল সমান হইবে, সেই মুহূর্তে চাকতিটি নিজের ভারে পড়িয়া যাইবে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, জলের ঊর্ধ্বচাপ ও নিম্নচাপ সমান এবং এই চাপ চোঙের মধ্যস্থ জলের ওজনের সমান।
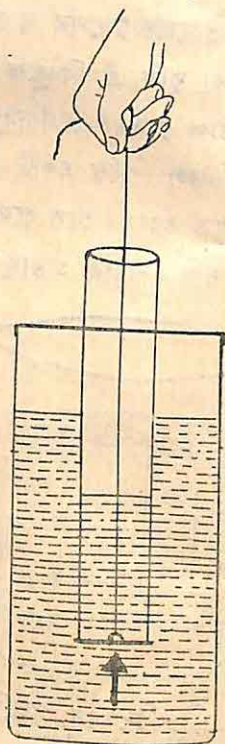
(ii) **তরলের পার্শ্বচাপ** (Lateral pressure) : একটি টিনের চোঙাকার পাত্র লওয়া হইল। এই পাত্রের নীচের দিকে একটি ছিদ্র আছে। ছিদ্রের মুখে একটি প্যাঁচকলযুক্ত নল লাগানো আছে। প্যাঁচকল বন্ধ করিয়া চোঙটিকে জলপূর্ণ করিয়া একটি কর্কের উপর বসাইয়া একটি বড় জলপূর্ণ পাত্রে ছাড়িয়া দিলে চোঙটি কর্কের উপর ভাসিবে। এখন প্যাঁচকল খুলিয়া দিলে নল দিয়া তীব্রবেগে জল বাহির হইয়া আসিবে এবং দেখা যাইবে যে, চোঙটি কর্কশুদ্ধ বিপরীত দিকে সরিয়া যাইতেছে। যখন প্যাঁচকল বন্ধ ছিল, তখন চোঙের মধ্যে যে কোন স্থানে জল সকল দিকে সমান চাপ দেয়। ফলে চোঙ স্থিরভাবে থাকে। যে মুহূর্তে কল খুলিয়া দেওয়া হইল, সেই মুহূর্তে নলের মুখে জলের পার্শ্বচাপ থাকিবে না। কিন্তু বিপরীত দিকের চাপ ঠিক রহিল। ফলে চোঙটি বিপরীত দিকে সরিয়া যাইবে।

(iii) **তরল সর্বদিকে সমান চাপ দেয়** (Liquid exerts equal pressure in all directions)

নিম্নলিখিত পরীক্ষা দ্বারা তরলের চাপ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা যায় :

(a) তরলের চাপ গভীরতার সহিত বৃদ্ধি পায়।

(b) একটি বিন্দুতে তরলের উর্ধ্বচাপ, নিম্নচাপ, পার্শ্বচাপ সমান।

(c) এক অনুভূমিক তলে তরল সর্বদিকে সমান চাপ দেয়।

একটি কাচের থিসিল ফানেল লইয়া ইহার মুখ পাতলা রবারের চাদর দ্বারা টান করিয়া বাঁধা হইল। এই ফানেলের সহিত একটি রবারের নল
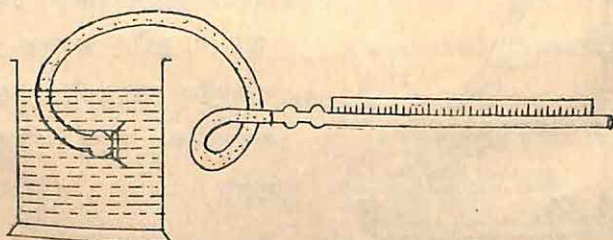
আটকানো আছে। রবারের নলের অপরপ্রান্তে একটি সরু কাচের নল আটকানো। এই কাচের নলে সামান্য পরিমাণ রঙীন জল থাকে। ইহা

সূচক-চিহ্নের কাজ করিবে। ফানেলের রবারের উপর হাত দিয়া চাপ দিলে ভিতরের বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার ফলে রঙীন জল বাহির দিকে সরিয়া যাইবে। সুতরাং রঙীন জল বাহির দিকে সরিলেই বুঝিতে পারিব যে, রবারের উপর চাপ পড়িয়াছে।

(a) ফানেলের মুখ নীচের দিকে রাখিয়া ফানেলটি একটি জলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে ডুবানো হইল। দেখা যাইবে যে, রঙীন জল কিছুটা সরিয়া গেল। জলের চাপের জন্যই এইরূপ হইল। তখন ফানেলটিকে ক্রমশঃ জলের গভীর হইতে গভীরে ডুবাইলে দেখা যাইবে যে, রঙীন জল ক্রমশঃ বাহিরের দিকে সরিতেছে। ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, জলের চাপ গভীরতার সহিত বৃদ্ধি পায়।

(b) যে-কোন গভীরতায় ফানেলটি স্থির রাখিয়া রঙীন জলের অবস্থান লক্ষ্য করা হইল। এখন ফানেলের মুখ ঐ একই গভীরতায় রাখিয়া মুখ উপর দিকে করা হইল। দেখা যায় যে, রঙীন জলের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হইল না। অনুরূপভাবে ফানেলের মুখ পার্শ্বের দিকে করিয়া বিভিন্ন দিকে ঘুরাইয়া ধরিলেও রঙীন জলের অবস্থানের কোন পরিবর্তন হইল না। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, জল সর্বদিকে সমান চাপ দেয়।
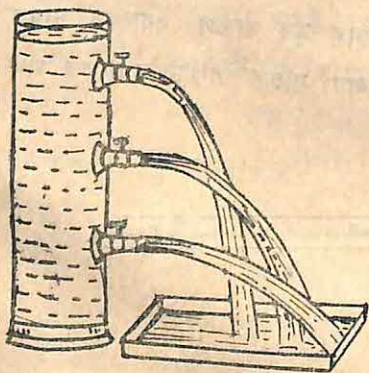
(c) একই গভীরতায় রাখিয়া ফানেলটিকে এক অনুভূমিক তলে বিভিন্ন স্থানে সরান হইল। দেখা যায় যে, রঙীন জলের কোন স্থান পরিবর্তন হইবে না। সুতরাং এক অনুভূমিক তলে তরলের চাপ সমান।

(iv) তরলের চাপ গভীরতার উপর নির্ভর করে (Liquid pressure increases with depth) : একটি লম্বা চোঙের পাত্রে পরপর তিনটি ছিদ্র আছে। চোঙটি জলপূর্ণ

করিলে দেখা যাইবে যে, তিনটি ছিদ্র দিয়াই জল বাহির হইয়া আসিবে। কিন্তু সর্বনিম্নের ছিদ্র দিয়া তীব্রবেগে জল বাহির হইবে এবং সর্বাপেক্ষা দূরে পড়িবে। সর্ব উপরের ছিদ্র দিয়া জল ধীরে ধীরে পড়িবে এবং সর্বাপেক্ষা নিকটে পড়িবে। সুতরাং বলা যায় যে, গভীরতার সহিত জলের চাপ বৃদ্ধি পায়।

৩.৩. **স্থির তরলের উপরের তল সর্বদা অনুভূমিক (Free surface of a liquid at rest is always horizontal) ঃ** কোন পাত্রে তরল ঢালিলে দেখা যায় যে, তরলের উপরিতল সর্বদা অনুভূমিক। পাত্রের ভূমিতে একই অনুভূমিক তলে দুইটি বিন্দু আছে। মনে করা যাক্ যে, তরলের উপরিতল অনুভূমিক নয়। প্রথম বিন্দুতে তরলের উচ্চতা h_1 ও
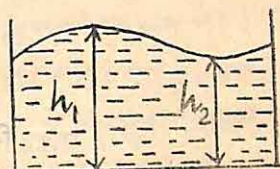
দ্বিতীয় বিন্দুতে উচ্চতা h_2। আমরা জানি যে, তরলের চাপ গভীরতার উপর নির্ভর করে এবং আরও জানি যে, একই অনুভূমিক তলে তরলের চাপ সমান। অতএব বিন্দু দুইটিতে তরলের চাপ সমান। সুতরাং বিন্দু দুইটিতে তরলের গভীরতা বিভিন্ন হইতে পারে না। অতএব h_1 ও h_2 সমান। যেহেতু বিন্দু দুইটি অনুভূমিক, সুতরাং তরলের উপরের তলও অনুভূমিক।

৩.৪. **পরস্পর যুক্ত পাত্রের তরল একই তলে থাকে (Liquid stands at the same height in a communicating vessel) ঃ** স্থির তলের উপরিতল সর্বদা অনুভূমিক। এই তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বলা হয় যে, তরল একই তলে থাকিতে চায় (water finds its own level)। এই নীতি অতি সহজেই প্রমাণ করা যায়। পাঁচটি কাচের পাত্রের তলদেশ পরস্পর নলদ্বারা যুক্ত। ইহার যে-কোন একটি পাত্রে জল
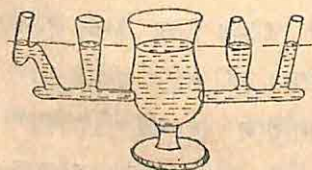
ঢালিলে দেখা যাইবে সবগুলি পাত্রে জলের উপরিতল একই অনুভূমিক তলে অবস্থান করে। প্রত্যেকটি পাত্রের তলদেশে একই অনুভূমিক তলে পাঁচটি

বিন্দু লওয়া হইল। যেহেতু বিন্দুগুলি এক অনুভূমিক তলে অবস্থিত, সুতরাং প্রত্যেকটি বিন্দুতে জলের গভীরতা সমান। সুতরাং তরল একই তলে থাকিবে। ইহা তরলের একটি বিশিষ্ট ধর্ম।
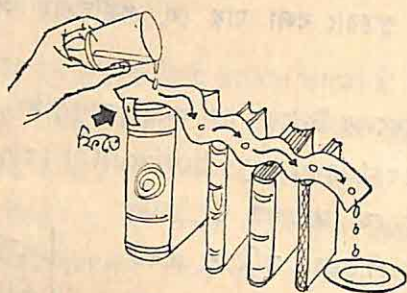
জলের নিম্নগতি এইভাবে পরীক্ষা করিতে পার

৩.৫. 'তরল একই তলে থাকিতে চায়' ধর্মের প্রয়োগ (Water finds its own level—its application) ঃ

(১) স্পিরিট লেভেল ঃ 'তরল একই তলে থাকিতে চায়' এই ধর্মের ব্যবহারিক প্রয়োগ স্পিরিট লেভেল। কোন স্থান অনুভূমিক কিনা জানিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়। একটি ঈষৎ বক্র দুই মুখ বন্ধ কাচের নল অ্যালকোহল পূর্ণ করা হয়। ভিতরে খুব ছোট একটি বুদ্‌বুদ্‌ রাখিয়া দেওয়া হয়। নলের উত্তল দিকটি উপরের দিকে থাকিলে বুদ্‌বুদ্‌ সর্বদা সর্বোচ্চ স্থান অর্থাৎ নলের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থান করিবে। এই নলটি একটি পিতলের অনুভূমিক তলের উপর উত্তল দিক উপরে করিয়া বসান থাকে। নলের সর্বোচ্চ স্থানের দুই পার্শ্বে দুইটি দাগ দেওয়া থাকে। কেবল অনুভূমিক তলে যন্ত্রটি বসাইলে বুদ্‌বুদ্‌টি ঠিক দাগ দুইটির মধ্যে থাকিবে। বুদ্‌বুদ্‌টি দাগ দুইটির মধ্যে না থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, তলটি অনুভূমিক নহে।

(২) কলিকাতা বা যে-কোন বড় শহরে কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটি

কর্তৃক বাসিন্দাদের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। 'তরল একই তলে থাকিতে চায়' এই নীতির উপর জল সরবরাহ করা হয়।
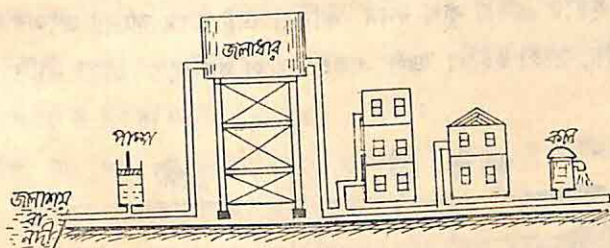
নিকটবর্তী কোন নদী, পুষ্করিণী বা গভীর নলকূপ হইতে জল পাম্প করিয়া খুব উঁচু একটি জলাধারে জমান হয়। জলাধার হইতে বড় বড় নল দ্বারা বিভিন্ন রাস্তায় এবং শাখা নল দ্বারা বিভিন্ন বাড়ীতে কলের মুখের সহিত যোগ করা হয়। যে-কোন একটি কল খুলিলে জলাধারের সহিত সমান তলে থাকিবার জন্য কলের মুখ হইতে জল জোরে বাহির হইয়া আসে। কলের মুখ জলাধারের অপেক্ষা নীচুতে থাকিলে কল হইতে জল পড়িবে। কার্যক্ষেত্রে নলের ঘর্ষণজনিত বাধা ও অন্যান্য কারণে জলের বেগ কিঞ্চিৎ হ্রাস পায়।

কলিকাতায় জল সরবরাহের জন্য কলিকাতার উত্তর প্রান্তে ২০ মাইল দূরে পলতায় ১০০ ফুট উঁচুতে একটি জলাধার আছে। কলিকাতায় আসিতে আসিতে জলের চাপ কমিয়া যাওয়ায় টালা প্রান্তে ঐ জল পাম্প করিয়া ১০০ ফুট উঁচু জলাধারে তোলা হয় এবং পরে সেখান হইতে শহরের বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা হয়।

(৩) আর্টেজিয় কূপ : পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ বিভিন্ন পদার্থের স্তরে বিভক্ত। এই স্তরগুলি কতকগুলি মাটি, পাথর, শ্লেট প্রভৃতি কঠিন পদার্থ দ্বারা গঠিত, আবার কতক স্তর নরম পদার্থ যেমন, বালি দ্বারা গঠিত। কঠিন স্তরের মধ্য দিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে না। কিন্তু নরম স্তরগুলির মধ্য দিয়া ভূপৃষ্ঠের জল পুষ্করিণী, নদী, হ্রদ, সমুদ্র প্রভৃতি হইতে চোঁয়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পৃথিবীর ভিতরের দিকে এই স্তরগুলির আকার বাটির মত। এখন যদি দুইটি কঠিন স্তরের মধ্যে একটি নরম স্তর থাকে, তাহা হইলে বৃষ্টির

জল চোঁয়াইয়া নরম স্তরের মধ্যে আটকাইয়া যায়। কখনও কখনও এই নরম স্তর বাঁকিয়া উপরে উঠিয়া আসে যাহা কোন নদীর সহিত যুক্ত থাকে। এখন যদি উপর হইতে একটি কূপ খনন করিয়া এই নরম স্তরের জলের তল পর্যন্ত পৌঁছান যায়, তাহা হইলে 'জল একই তলে থাকিতে চায়' নীতি অনুযায়ী
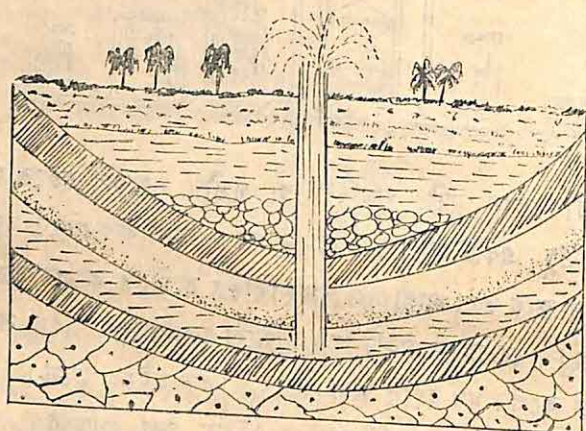
ভিতরের জল, বাহিরের নদীর জলের সহিত একই তলে থাকিবার জন্য ঐ কূপ দিয়া উপরে উঠিয়া আসে এবং ফোয়ারার মত জোরে নির্গত হয়। ফ্রান্সের অন্তর্গত অর্টোয়া (Artois) নামক স্থানে সর্বপ্রথম এই প্রকার কূপ খনন করা হয়। সেজন্য ইহাকে আর্টেজিয় (Artesian) কূপ বলা হয়। উষ্ণ প্রস্রবণও একটি আর্টেজিয় কূপ।

৩.৬. **আর্কিমিডিসের সূত্র ও প্লবতা** (Archimedes' Principle & Buoyancy) : আমরা প্রায়ই দেখি যে, একটি ভারী বস্তু জলে ডুবাইলে মনে হয় হাল্কা হইয়া গিয়াছে। কূপ হইতে জল তুলিবার সময় যতক্ষণ জলপূর্ণ বালতি জলের মধ্যে থাকে, ততক্ষণ ইহাকে সহজেই তোলা যায়, কিন্তু জল হইতে বাহিরে আনিলে ইহাকে সহজে তোলা যায় না। অতএব বলিতে পারি যে, যে কোন বস্তু জলে বা তরলে পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত করিলে ইহার ওজনের আপাত হ্রাস হয়।

কোন বস্তু যে-কোন তরলে পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত করিলে, ইহার

ওজন নিম্নমুখে ক্রিয়া করে এবং তরল ইহার উপর একটি ঊর্ধ্বমুখী ঘাত প্রয়োগ করে। ইহার ফলে বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাস হয়। আর্কিমিডিস প্রমাণ করিয়াছেন যে, বস্তুর এই ওজনের আপাত হ্রাস, বস্তু যে আয়তনের তরল স্থানচ্যুত করে তাহার ওজনের সমান। বস্তুর উপরে তরল কর্তৃক প্রযুক্ত ঊর্ধ্বমুখী ঘাতকে প্লবতা (Buoyancy) বলে।

তরলে আংশিক বা পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুর যে ওজন পাওয়া যায়, তাহাকে আপাত ওজন (Apparent weight) বলে। বস্তুর প্রকৃত ওজন ও বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজন বিয়োগ করিলে, বস্তুর আপাত ওজন পাওয়া যাইবে।

আর্কিমিডিসের নীতি ঃ কোন বস্তুকে যে-কোন তরলে পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত করিলে বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাস হয় এবং এই আপাত হ্রাস বস্তু কর্তৃক যে আয়তনের তরল অপসারিত হয় তাহার ওজনের সমান।

৩.৭. আর্কিমিডিসের নীতির সত্যতা পরীক্ষা ঃ পরীক্ষাগারে এই সূত্রের সত্যতা পরীক্ষার জন্য একটি ফাঁপা পিতলের চোঙ A ও ইহার ভিতরে বায়ু-নিরুদ্ধভাবে আটকানো যায় এমন একটি নিরেট পিতলের চোঙ B লওয়া হইল। A চোঙের উপরে একটি আংটা ও নীচে একটি হুক আছে। B চোঙের উপরে একটি আংটা আছে। এই পরীক্ষার জন্য একটি বিশেষভাবে প্রস্তুত তুলাযন্ত্র লওয়া হয়। এই তুলাযন্ত্রের একদিকে একটি হুক লাগানো আছে। এই হুক হইতে A চোঙটি ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। A চোঙের নীচের হুক হইতে একটি সূতা দ্বারা B চোঙটি ঝুলান হইল। এই অবস্থায় ইহাদের সম্মিলিত ওজন লওয়া হইল। এখন

একটি বীকারে জলপূর্ণ করিয়া B চোঙের নীচে এমনভাবে রাখা হইল যে, B
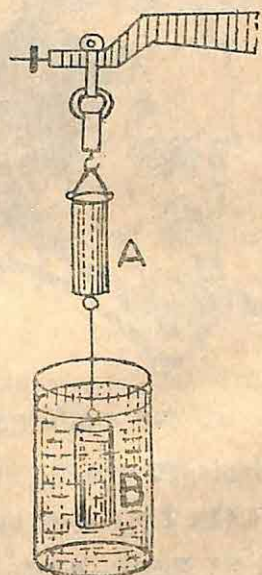
চোঙটি জলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হয়। এই অবস্থায় দেখা যাইবে যে, A ও B-র সম্মিলিত ওজন হ্রাস পাইয়াছে।

এখন A চোঙে ধীরে ধীরে জল ঢালা হইল। ইহাতে A-র ওজন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে মুহূর্তে A চোঙ জলপূর্ণ হইল সেই মুহূর্তে A ও B-র সম্মিলিত ওজন পূর্বের ওজন ফিরিয়া পাইল।

অতএব প্রমাণ হইল যে, B চোঙ জলে পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত করিলে ইহার ওজনের আপাত হ্রাস হয়। তখন B চোঙের আয়তন ও A চোঙের ভিতরের আয়তন সমান। সুতরাং ওজনের আপাত হ্রাস A চোঙ কর্তৃক অপসারিত জলের ওজনের সমান।

৩.৮. আর্কিমিডিসের জীবনী : গ্রীসের অন্তর্গত সিসিলি দ্বীপের সারাকিউজ নগরে খ্রীস্টপূর্ব ২৮৭ অব্দে আর্কিমিডিসের জন্ম হয়। তাঁহার পরীক্ষাগুলি অধিকাংশই দেশের প্রয়োজনে ও স্বার্থে আবিষ্কৃত হয়।

আর্কিমিডিস পুলি বা কপিকল, হাইড্রলিক, বায়ুচাপ সম্বন্ধীয় যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করেন। রোমানরা সারাকিউজ আক্রমণ করিলে, আর্কিমিডিস ছোট ছোট দর্পণ জুড়িয়া একটি বৃহৎ অবতল দর্পণ প্রস্তুত করেন এবং সূর্যের দিকে মুখ করিয়া ধরিয়া সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া রোমানদের জাহাজের পালের উপর ফেলেন, ফলে সমস্ত যুদ্ধ জাহাজে আগুন লাগিয়া বিধ্বস্ত হয় এবং রোমানরা পরাজিত হয়।

এই সময় সারাকিউজের রাজা হীরো তাঁহার একটি স্বর্ণমুকুট প্রস্তুত করিবার জন্য স্বর্ণকারকে কিছু পরিমাণ স্বর্ণ দেন। মুকুটটি তৈয়ারী হইবার পর হঠাৎ তাঁহার সন্দেহ হয় যে, মুকুটটি বিশুদ্ধ স্বর্ণের নহে। ইহাতে অন্য ধাতু মিশ্রিত আছে। সন্দেহ হওয়া মাত্র তিনি আর্কিমিডিসকে ইহার সত্যতা নিরূপণ করিতে বলেন। আর্কিমিডিস প্রথমে রীতিমত চিন্তিত হইলেন।

কিছুতেই তিনি কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। একদিন স্নান করিবার জন্য তিনি জামা-কাপড় খুলিয়া কানায় কানায় পূর্ণ একটি চৌবাচ্চায় স্নান করিবার জন্য নামিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বেশ কিছুটা জল উপচাইয়া পড়িল। ইহাতে তাঁহার মস্তিষ্কে বিদ্যুৎ চমকের মত খেলিয়া গেল যে, সমান ওজনের বিভিন্ন পদার্থ জলে ডুবাইলে বিভিন্ন পরিমাণ জল অপসারিত করিবে। এই সম্বন্ধে তিনি এতদূর স্থির নিশ্চিত যে, নিজের সম্বন্ধে কোন খেয়াল না করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় 'ইউরেকা', 'ইউরেকা' (পাইয়াছি, পাইয়াছি) বলিয়া চেঁচাইতে চেঁচাইতে রাজপথ দিয়া দৌড়াইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, একখণ্ড বিশুদ্ধ সোনা ও সমান ওজনের অবিশুদ্ধ সোনা জলে ডুবাইলে বিভিন্ন পরিমাণ জল অপসারণ করিবে। ইহা হইতে বিখ্যাত আর্কিমিডিসের সূত্র আবিষ্কৃত হয়।

খ্রীস্টপূর্ব ২১২ অব্দে রোমানরা সারাকিউজ আক্রমণ করে এবং সৈন্যরা নগরের তোরণ ভাঙিয়া ভিতরে প্রবেশ করে এবং কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের গৃহে প্রবেশ করে। আর্কিমিডিস সেই সময় ঘরের মেঝেতে বালি ছড়াইয়া বালির উপর জ্যামিতির চিত্র অঙ্কন করিয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতেছিলেন। বিভিন্ন প্রশ্নের কোন উত্তর না পাইয়া, সৈন্যরা বৈজ্ঞানিককে চিনিতে না পারিয়া হত্যা করে। হত্যার পূর্বে তিনি চিৎকার করিয়া বলেন, আমাকে হত্যা কর, আমার চিত্রগুলি হত্যা করিও না।

৩.৯. **ভাসমান বস্তুর সাম্যাবস্থা** (Equilibrium of floating bodies) ঃ একটি বস্তুকে তরলে নিমজ্জিত করিলে, ইহার উপর দুইটি বল ক্রিয়া করে। বস্তুটির নিজস্ব ওজন (w) নিম্নমুখে এবং উর্ধ্ব মুখে প্লবতা (w_1) যাহা বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজনের সমান। এই দুইটি বলের একত্র ক্রিয়ার ফলে তিনটি অবস্থার সৃষ্টি হয়—

(১) বস্তুর ওজন (w) যদি প্লবতার (w_1) অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে বস্তুটি তরলে ডুবিয়া যাইবে। এই কারণে লোহা জলে ডুবিয়া যায়।

(২) বস্তুর ওজন যদি প্লবতার সমান হয়, তাহা হইলে বস্তুর উপর কোন বলই ক্রিয়া করিবে না। এই ক্ষেত্রে বস্তুটি তরলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়া

যে-কোন স্থানে ভাসিতে থাকিবে। এই ক্ষেত্রে বস্তুর ঘনত্ব ও তরলের ঘনত্ব সমান। জল ও অ্যালকোহলের ঘনত্বের মাঝামাঝি বরফের ঘনত্ব। একখণ্ড বরফকে সমআয়তন জল ও অ্যালকোহলের মিশ্রণে ছাড়িয়া দিলে বরফখণ্ডটি তরলের মধ্যে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত অবস্থায় যে কোন স্থানে ভাসিতে থাকিবে।

(৩) বস্তুর ওজন যদি প্লবতার কম হয় তাহা হইলে বস্তুটির উপর ঊর্ধ্বমুখী ঘাত নিম্নমুখী বল অপেক্ষা বেশী। সুতরাং বস্তুটি ভাসিয়া উঠিবে। বস্তুটি কিয়দংশ বাহিরে রাখিয়া তরলে ভাসিতে থাকিবে। ইহাই ভাসমান বস্তুর সাম্যাবস্থা। এই ক্ষেত্রে বস্তুটির ঘনত্ব তরলের ঘনত্ব অপেক্ষা কম।
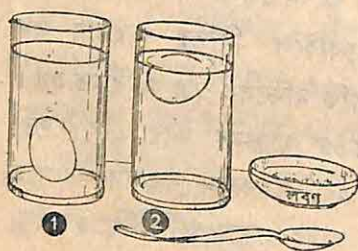
(১) শুধু জলে ডিম ডুবিয়া যায়।
(২) কিন্তু নুনজলে ডিম ভাসে।

অতএব ভাসমান বস্তুর সাম্যাবস্থার জন্য দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে :—

(ক) ভাসমান বস্তু কর্তৃক অপসারিত তরলের ওজন, বস্তুর ওজনের সমান হইবে।

(খ) বস্তুটির ওজন যে বিন্দুতে ক্রিয়া করে তাহাকে ভারকেন্দ্র এবং প্লবতা যে বিন্দুতে ক্রিয়া করে তাহাকে ইহার প্লবতাকেন্দ্র বলে। এই দুইটি বিন্দু একই উল্লম্ব রেখায় অবস্থান করিবে।

৩.১০. আর্কিমিডিস সূত্র এবং ভাসমান অবস্থার কয়েকটি দৃষ্টান্ত।

(১) বস্তুর আয়তন নির্ণয় : আর্কিমিডিস সূত্রের সাহায্যে একটি অসম বস্তুর আয়তন সহজেই নির্ণয় করা যায়। বস্তুটি বায়ুতে ওজন করা হইল এবং জলে নিমজ্জিত করিয়া আপাত ওজন বাহির করা হইল। দুইটি ওজনের পার্থক্য হইতে ওজনের আপাত হ্রাস বাহির করা হইল। বস্তুটির ওজনের আপাত হ্রাস বস্তু কর্তৃক অপসারিত জলের ওজনের সমান। এই ওজনকে জলের ঘনত্ব দ্বারা ভাগ করিলে বস্তু কর্তৃক অপসারিত জলের আয়তন পাওয়া যাইবে। বস্তুটির আয়তন এই অপসারিত জলের আয়তনের সমান।

(২) বস্তুটি ফাঁপা কিনা নির্ণয় করা ঃ বায়ুতে ওজন করা হইল এবং জলে নিমজ্জিত করিয়া ওজন করা হইল। দুইটি ওজনের পার্থক্যকে জলের ঘনত্ব দ্বারা ভাগ করিয়া বস্তুটির আয়তন নির্ণয় করা হইল। পুনরায় বস্তুটির ওজনকে ইহার ঘনত্ব দ্বারা ভাগ করিলে বস্তুটির আয়তন পাওয়া যাইবে। যদি দুই প্রকারের মিলিত আয়তন সমান হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, বস্তুটি নিরেট। কিন্তু যদি দ্বিতীয় আয়তন, প্রথমটি অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে বস্তুটি ফাঁপা।

(৩) বরফ জলে ভাসে ঃ কারণ বরফের ঘনত্ব জলের ঘনত্ব অপেক্ষা কম। বরফের ঘনত্ব ০.৯২ গ্রাম / সি.সি. এবং জলের ঘনত্ব ১ গ্রাম / সি.সি./১২ সি.সি. বরফের ওজন ১১ গ্রাম, কিন্তু ১১ সি.সি. জলের ওজন ১১ গ্রাম। দেখা যায় যে, ১২ সি.সি. আয়তনের বরফ জলে ভাসে এবং ইহার ১১ সি.সি. জলের নীচে এবং ১ সি.সি. বা $\frac{১}{১২}$ অংশ জলের উপরে থাকে।

(৪) লোহার জাহাজ জলে ভাসে ঃ লোহা জল অপেক্ষা ভারী, কিন্তু লোহার তৈয়ারী জাহাজ জলে ভাসে। আমরা লোহার কড়াই জলে ভাসিতে দেখি। ইহার কারণ এই যে, লোহাকে পিটাইয়া এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, ইহাকে জলে ছাড়িয়া দিলে, ইহার ওজন, সম-আয়তন জলের ওজন অপেক্ষা কম হয়। সেজন্য ইহা জলে ভাসে।
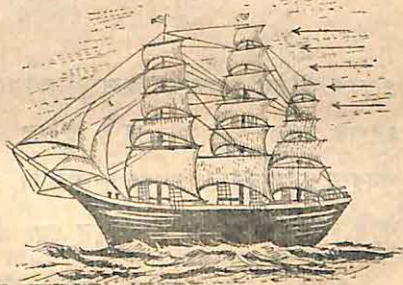
জাহাজের তলদেশ কড়াইয়ের মত অবতল হওয়ায়, ইহার ওজন সম-আয়তন জলের ওজন অপেক্ষা কম হয়। সেজন্য লোহার জাহাজ জলে ভাসে।

নদীর জলের ঘনত্ব সমুদ্রের জলের ঘনত্ব অপেক্ষা কম। সেজন্য একটি জাহাজ সমুদ্র হইতে নদীতে প্রবেশ করিলে, জাহাজের ওজনের সমান জল অপসরণের জন্য জাহাজের বেশী অংশ নিমজ্জিত হয়।

(৫) **মানুষের সাঁতার কাটা ঃ** মানুষের মাথা সম-আয়তন জল অপেক্ষা ভারী, সেজন্য জলের মধ্যে নামিলে মানুষের দেহ হাল্কা হয় বলিয়া ভাসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু মাথা ঝুলিয়া পড়িয়া ডুবিতে চেষ্টা করে। হাত-পায়ের পেশী

সঞ্চালন করিয়া জলে প্রয়োজনীয় চাপ দিয়া মাথা জলের উপর রাখিবার উপায়কেই সাঁতার কাটা বলে।

(৬) **ডুবো জাহাজ (Submarine) ঃ** ডুবো জাহাজ ইচ্ছামত জলে ভাসিতে এবং ডুবিতে পারে। ডুবো জাহাজের মধ্যে কতকগুলি জলের চৌবাচ্চা আছে। ইহাদের সঙ্গে প্যাঁচকলযুক্ত নল আটকানো আছে। নলটির একপ্রান্ত সমুদ্র জলে ডুবানো থাকে। প্যাঁচকল খুলিয়া দিলে সমুদ্রের জল
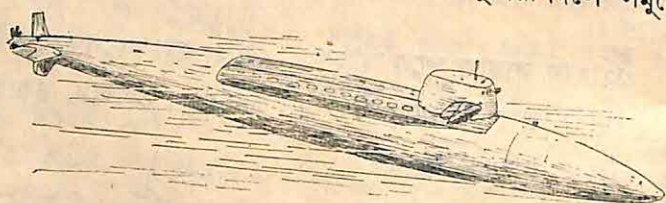
প্রবেশ করিয়া চৌবাচ্চা জলপূর্ণ করিবে। ইহাতে জাহাজের ওজন, সম-আয়তন জলের ওজন অপেক্ষা বেশী হইবে এবং জাহাজটি জলে ডুবিয়া যাইবে। পুনরায় ভাসাইবার প্রয়োজন হইলে, পাম্পের সাহায্যে চৌবাচ্চাগুলি জলশূন্য করিলে জাহাজটি হাল্কা হইবে এবং ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিবে।

৩.১১. বায়ুর প্লবতা এবং আর্কিমিডিস সূত্রের প্রয়োগ (Buoyancy of air and application of Archimedes' principle) ঃ আর্কিমিডিস সূত্র হইতে আমরা জানি যে, কোন বস্তুকে তরলে নিমজ্জিত করিলে ইহা একটি উর্ধ্বমুখী ঘাত অনুভব করে এবং নিমজ্জিত অবস্থায় বস্তুর যে ওজন পাওয়া যায়, তাহা বস্তুর প্রকৃত ওজন নহে। ইহা আপাত ওজন এবং এই ওজন প্রকৃত ওজন অপেক্ষা কম। অনুরূপভাবে বলা যায়, কোন

বস্তুকে বায়ুতে ওজন করিলে, বায়ু বস্তুর উপর একটি ঊর্ধ্বমুখী ঘাত প্রয়োগ করিবে এবং আমরা যে ওজন পাইব, তাহা প্রকৃত ওজন অপেক্ষা সামান্য কম। বায়ু খুব হাল্কা বলিয়া, এই আপাত হ্রাস খুবই সামান্য। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা এই আপাত হ্রাস দেখানো যায়। কোন কোন পরীক্ষায় বস্তুর প্রকৃত ওজন প্রয়োজন হয়। সেখানে বস্তুর আপাত ওজনের সহিত বস্তু কর্তৃক অপসারিত বায়ুর ওজন যোগ করিয়া, বস্তুর প্রকৃত ওজন নির্ণয় করা হয়। ইহাকে প্লবতা সংশোধন বলে।

নিম্নের পরীক্ষা হইতে বায়ুর প্লবতা প্রমাণ করা যায়। একটি তুলাযন্ত্রের একপার্শ্বে একটি বড় কর্কের গোলক S ঝুলাইয়া দেওয়া হইল। অপর পার্শ্বে পিতলের বাটখারা W দিয়া ইহাদের ওজনের সমতা আনা হইল। এখন এই তুলাযন্ত্রটি একটি পাম্পের প্লেট R-এর উপর বসাইয়া একটি কাচের জার দ্বারা বায়ু-নিরুদ্ধভাবে ঢাকা দেওয়া হইল। এখন পাম্প চালাইয়া T নল দিয়া ধীরে ধীরে বায়ু বাহির করিয়া লইলে দেখা যাইবে যে, তুলাযন্ত্রে কর্কের গোলকের দিকটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ বায়ুর প্লবতা। কর্কের আয়তন বাটখারার আয়তন অপেক্ষা অনেক বেশী, সুতরাং কর্কের ওজনের আপাত হ্রাস বেশী হইবে, কারণ ইহা অধিক বায়ু অপসারণ করে। অতএব বলা যায় যে, ইহাদের আপাত ওজন সমান। যেহেতু কর্কের ওজনের আপাত হ্রাস অধিক, সুতরাং কর্কের প্রকৃত ওজন, বাটখারার ওজন অপেক্ষা বেশী হইবে।
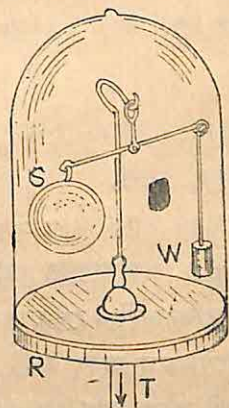
একটা কথা লোকমুখে প্রায়ই শোনা যায় যে, ১ কেজি তূলা, এক কেজি লোহা অপেক্ষা ভারী—কথাটা একটি হেঁয়ালির মতন। উভয় বস্তুর ওজন ১ কেজি হইলে, তূলা কিরূপে ভারী হইবে? ইহার অর্থ এই যে, তূলা বা লোহার বায়ুতে ওজন ১ কেজি। ইহা তাহাদের প্রকৃত ওজন নহে।—যেহেতু তূলার আয়তন লোহা অপেক্ষা অনেক বেশী সেইজন্য তূলার ওজনের আপাত

হ্রাস অধিক হইয়াছে। অতএব শূন্য স্থানে ওজন করিলে তূলার প্রকৃত ওজন লোহা অপেক্ষা বেশী হইবে।

উপরি-উক্ত পরীক্ষাগুলি হইতে আমরা বলিতে পারি যে, তরলের ন্যায় গ্যাসেও আর্কিমিডিস সূত্র প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং আর্কিমিডিসের সংজ্ঞা নিম্নরূপে লেখা যায়—

কোন বস্তুকে তরলে বা গ্যাসে পূর্ণ বা আংশিক নিমজ্জিত করিলে, বস্তুর ওজনের আপাত হ্রাস হয় এবং এই আপাত হ্রাস বস্তু কর্তৃক যে আয়তনের তরল বা গ্যাস অপসারিত করে তাহার ওজনের সমান।

চতুর্থ অধ্যায়

পদার্থ (Matter)

৪.১. পদার্থের প্রকারভেদ (Different states of matter) : আমাদের চারিপার্শ্বে যাহা দেখি, সবগুলিই এক একটি পদার্থ। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, জল, মাটি, লোহা, পাথর সবগুলিই পদার্থ। পদার্থগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা, (১) কঠিন, (২) তরল, (৩) বায়বীয়।

যে সকল পদার্থের নিজস্ব আকার ও নির্দিষ্ট আয়তন আছে, তাহাদের কঠিন পদার্থ বলে। যেমন—ইট, কাঠ, লোহা, পিতল।

যে সকল পদার্থের নিজস্ব কোন আকার নাই, কিন্তু নির্দিষ্ট আয়তন আছে, তাহাদের তরল পদার্থ বলে। তরল পদার্থকে যে পাত্রে রাখা হয়, সেই পাত্রের আকৃতি পায়। যেমন—জল, গ্লিসারিণ, তেল।

যে সকল পদার্থের নিজস্ব কোন আকার নাই এবং নির্দিষ্ট আয়তনও নাই তাহাদের বায়বীয় পদার্থ বলে। বায়বীয় পদার্থকে যে-কোন পাত্রে রাখিলে সেই পাত্রকে সম্পূর্ণ পূর্ণ করে। যেমন—বায়ু, হাইড্রোজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড।

৪.২. পদার্থের ধর্ম (Properties of matter): প্রত্যেক পদার্থের নিজস্ব কতকগুলি ধর্ম বা গুণ আছে। পদার্থের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুবিধার জন্য বৈজ্ঞানিকেরা পদার্থের ধর্মগুলিকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন: (১) ভৌতধর্ম (Physical Properties), (২) রাসায়নিক ধর্ম (Chemical Properties)।

ভৌতধর্ম: যে ধর্মে পদার্থের শুধু বাহিক অবস্থা বা বাহিক গুণের প্রকাশ পায় তাহাকে ভৌতধর্ম বলে। ভৌতধর্ম বলিতে নিম্নলিখিত বাহিক অবস্থা বা গুণগুলিকে বুঝায়: (১) কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবস্থা, (২) বর্ণ, (৩) গন্ধ, (৪) স্বাদ, (৫) হিমাঙ্ক, গলনাঙ্ক বা স্ফুটনাঙ্ক, (৬) জলে বা তরল পদার্থে দ্রবণীয়তা, (৭) ঘনত্ব, (৮) আকৃতি ও আয়তন, (৯) তাপ ও বিদ্যুৎ-পরিবহনের ক্ষমতা ইত্যাদি।

রাসায়নিক ধর্ম: যে ধর্মে পদার্থের গঠন এবং ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যায় তাহাকে রাসায়নিক ধর্ম বলে। রাসায়নিক ধর্ম নির্ণয়ের জন্য সাধারণতঃ (১) জল, (২) বায়ু, (৩) উত্তাপ, (৪) অ্যাসিড এবং ক্ষার নামক বিশেষ পদার্থ বা অন্যান্য পদার্থের সংযোগে ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটে কিনা এবং পদার্থটির আভ্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন হয় কিনা পরীক্ষা করা হয়। বিভিন্ন কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের ধর্ম বিভিন্ন।

৪.৩. পদার্থের ধর্মের উপর বহিঃশক্তির প্রভাব (Influence of external factors on properties of matter): পদার্থের ধর্ম বিভিন্ন কারণে পরিবর্তিত হয়। (১) বাহিক বল প্রয়োগে পদার্থের প্রসারণ বা সঙ্কোচন হয়। বল অপসারণ করিলেই ইহা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে। ইহাকে স্থিতিস্থাপকতা বলে।—একটি লোহার স্প্রিং দুইহাত দিয়া টানিলে বাড়িয়া যায়। টান বন্ধ করিলেই পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসে।

(২) কোন তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে, তার সেই তড়িৎ-প্রবাহকে বাধা দিতে পারে। পদার্থের এই ধর্মকে রোধ (Resistance) বলে। তাপ প্রয়োগ করিলে পদার্থের রোধ বৃদ্ধি পায়। যেমন, একটি

ইলেক্‌ট্রিক বাতিতে যে তার থাকে, তাহার রোধ খুব বেশী। কিন্তু তড়িৎ প্রবাহিত করিলে তারটি উত্তপ্ত হয় এবং রোধ বৃদ্ধি পায়। ফলে তারটি শ্বেততপ্ত হইয়া আলোক প্রদান করে। কার্বন গুঁড়ার রোধ চাপের প্রভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। চাপ দিলে রোধ কমিয়া যায় এবং চাপ অপসারণ করিলে রোধ বাড়িয়া যায়।

(৩) তাপ প্রয়োগ করিলে বস্তুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক তাপে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন হয়। এক টুকরা বরফকে তাপ দিলে ইহা গলিয়া জল হয় এবং আরও তাপ দিলে জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে জল ফুটিয়া বাষ্পে পরিণত হয়।

(৪) তাপ প্রয়োগে বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন হয়। একটি ম্যাগনেসিয়াম তার জ্বালাইলে ইহা হইতে উজ্জ্বল আলো বাহির হয় এবং ম্যাগনেসিয়াম বায়ুর অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয়। উহাই আমরা ছাইরূপে পড়িয়া থাকিতে দেখি।

একটি পাত্রে অ্যাসিড্ মিশ্রিত জলে দুইটি প্লাটিনাম পাত ডুবান আছে। এই পাত দুইটি একটি ব্যাটারির সহিত যোগ করিলে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে জল বিয়োজিত হইয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাসে পরিণত হয়।

(৫) একটি লোহার দণ্ডের উপর অন্তরিত তামার তার জড়াইয়া, সেই তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে লোহার দণ্ডটি চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। অতএব দেখা যায় যে, বিভিন্ন শক্তির প্রভাবে পদার্থের ভৌতিক বা রাসায়নিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। যান্ত্রিকশক্তি, তাপশক্তি, তড়িৎশক্তি পদার্থের ধর্মের পরিবর্তনে সাহায্য করে।

৪.৪. কোন বস্তুকে তাপ দিলে ইহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর প্রসারণ হয়। কঠিন, তরল বা বায়বীয় যে-কোন বস্তুই হউক না কেন, তাপ প্রদানে ইহার প্রসারণ হইবেই। কাহারও প্রসারণ অধিক, কাহারও খুব সামান্য। কঠিন পদার্থের প্রসারণ সামান্য, কিন্তু গ্যাসের প্রসারণ খুব বেশী। কঠিন পদার্থের ভিতর তামা, পিতল, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা প্রভৃতি ধাতব বস্তুর প্রসারণ খুব বেশী। কিন্তু ইট, কাঠ, রবার প্রভৃতি বস্তুর

প্রসারণ খুবই সামান্য। কঠিন পদার্থের প্রসারণ তিন প্রকার—(১) দৈর্ঘ্য প্রসারণ—একটি পিতলের দণ্ডকে তাপ দিলে ইহার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়। (২) ক্ষেত্রফল প্রসারণ—একটি আয়তাকার প্লেটকে উত্তপ্ত করিলে ইহার ক্ষেত্রফলের বৃদ্ধি পায়। (৩) আয়তন প্রসারণ—একটি লোহার গোলককে তাপ দিলে ইহার আয়তন বৃদ্ধি পায়।

৪.৫. কঠিন পদার্থের এই প্রসারণ ধর্মকে আমরা বহু কাজে দৈনন্দিন ব্যবহার করি। কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা আমাদের সুবিধার সৃষ্টি করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে।

প্রসারণের ব্যবহারিক সুবিধাঃ (ক) একটি কাচের বোতলের ছিপি যদি খুব জোরে আটকাইয়া যায়, তাহা হইলে বোতলের মুখে গরম জল ঢালিলে বোতলের মুখের আয়তন প্রসারণ হইবে এবং ছিপি আলগা হইয়া খুলিয়া আসিবে।

(খ) গরুর গাড়ীর চাকায় লোহার বেড় পরান থাকে, তোমরা নিশ্চয়ই দেখিয়াছ। গাড়ীর চাকার ব্যাসের চেয়ে কিছুটা ছোট একটি লোহার বেড় লওয়া হয়। এখন বেড়টি আগুনে উত্তপ্ত করিলে ইহার প্রসারণ হয়, তখন ইহা সহজেই চাকায় পরান যায়। গরম বেড়টি কাঠের চাকায় পরাইয়া ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দেওয়া হয়। ইহাতে বেড়টি শীতল হইয়া ছোট হয় ও চাকার উপর দৃঢ়ভাবে আটকাইয়া বসিয়া যায়।

প্রসারণের জন্য অসুবিধাঃ (ক) রেল লাইন পাতিবার সময় দুইটি রেলের মধ্যে ফাঁক রাখা হয়। গরমকালে সূর্যের তাপে রেল লাইনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ হয়। আবার গাড়ী চলিবার সময় ঘর্ষণে রেল লাইন উত্তপ্ত হয়। যদি রেল দুইটি পরপর বসান থাকে তাহা হইলে লাইন উত্তপ্ত হইলে রেলের দৈর্ঘ্য প্রসারণ হইবে, কিন্তু প্রসারণের কোন স্থান না থাকায়, লাইন বাঁকিয়া দুমড়াইয়া যাইবে। সূর্যের তাপে বা গাড়ীর চাকার ঘর্ষণে উত্তপ্ত হইয়া রেল লাইনের প্রসারণের সুবিধার জন্য দুইটি রেলের মধ্যে ফাঁক রাখা হয়।

কিন্তু ট্রাম লাইন পাতিবার সময় ঐরূপ কোন ফাঁক রাখিতে হয় না। কারণ ট্রাম লাইন মাটির উপর বসান যায় এবং গ্রানাইট পাথরের তৈয়ারী

ইটের দ্বারা দৃঢ়ভাবে আটকানো থাকে। সূর্যের তাপে বা ট্রাম গাড়ীর ঘর্ষণে উত্তপ্ত হইলে, অতিরিক্ত তাপ মাটিতে চলিয়া যায় এবং তাপমাত্রার পার্থক্য খুব বেশী হইতে পারে না। উপরন্তু শক্ত গ্রানাইট পাথরে আটকানো থাকে বলিয়া লাইন সামান্য উত্তপ্ত হইলেও দৈর্ঘ্য প্রসারণের জন্য বাঁকিতে পারে না।
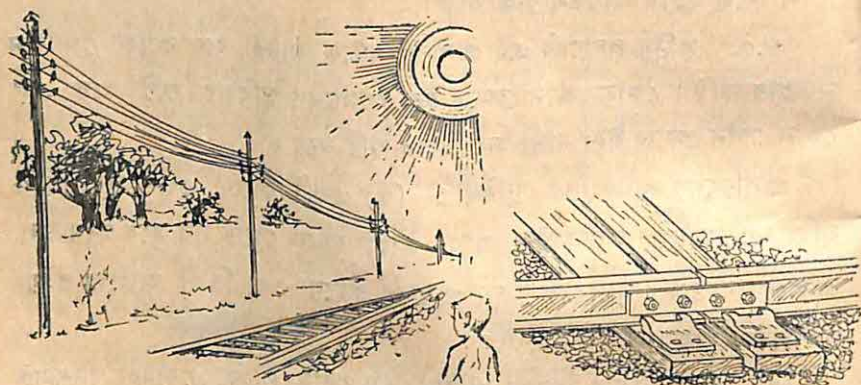
(খ) টেলিগ্রাফ্ বা ইলেকট্রিক তার দুইটি খুঁটির মাথায় টাঙানোর সময় ঝুলাইয়া রাখা হয়। যদি তার সোজা এবং টান করিয়া বাঁধা থাকিত, তাহা হইলে শীতকালে ঠাণ্ডায় তারগুলির দৈর্ঘ্য হ্রাসপাইত এবং টান পড়িয়া ছিঁড়িয়া যাইত। দৈর্ঘ্য হ্রাসের ফলে যাহাতে তারগুলি ছিঁড়িয়া না যায় সেইজন্য তারগুলি আলগাভাবে ঝুলাইয়া টাঙানো হয়।

(গ) ধাতব স্কেলে যে পাঠ থাকে, তাহা একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় প্রস্তুত করা হয়। তাপমাত্রার হ্রাস বা বৃদ্ধি হইলে স্কেলের পাঠ ভুল হইবে। সুতরাং পাঠের সংশোধনের প্রয়োজন হয়। ব্যারোমিটারে যে ধাতব স্কেল থাকে, জমির মাপ লইবার জন্য যে ধাতব ফিতা ব্যবহার করা হয়, তাহাদের তাপমাত্রার সংশোধন প্রয়োজন হয়।

৪.৬. বল ও রিঙের পরীক্ষা: এই পরীক্ষা দ্বারা কঠিন পদার্থের প্রসারণ দেখানো যায়। একটি পিতলের বলকে একটি দণ্ডের মাথায় একটি আংটা হইতে শিকলের সাহায্যে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। একটি পিতলে রিঙ লওয়া হয়। রিঙটি ঐ দণ্ডের মধ্যস্থলে আটকানো থাকে। ঠাণ্ডা অবস্থায় বলটি

আংটার ভিতর দিয়া গলিয়া যাইতে পারে। এখন বলটিকে উত্তপ্ত করা হইল এবং রিঙের উপর বলটিকে ছাড়িয়া দিলে দেখা যাইবে বলটি আর গলিয়া যাইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে বলটি ঠাণ্ডা হইলে পুনরায় ইহা রিঙের ভিতর দিয়া গলিয়া যাইবে। সুতরাং বলা যায় যে, তাপ পাইয়া বলের আয়তন প্রসারণ হইয়াছে বা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

৪.৭. যুগ্ম ধাতব দণ্ড (Bi-metal Strip): বিভিন্ন কঠিন পদার্থের প্রসারণ সমান নহে। পিতলের প্রসারণ খুব বেশী, কিন্তু লোহার প্রসারণ পিতল অপেক্ষা কম।

দুইটি সমান মাপের পাত, একটি পিতল ও অপরটি লোহার, লওয়া হইল। পাত দুইটি আর একটির উপর রাখিয়া দুই প্রান্ত আংটার সাহায্যে দৃঢ়ভাবে আটকানো। দণ্ড দুইটির একপ্রান্তে একটি কাঠের হাতল বসান। ঠাণ্ডা অবস্থায় হাতল ধরিয়া রাখিলে যুগ্মদণ্ডটি সোজা থাকিবে। এখন যুগ্মদণ্ডটি উত্তপ্ত করা হইল। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে পিতলের দণ্ডটির প্রসারণ লোহা অপেক্ষা বেশী হইবে। ফলে যুগ্মদণ্ডটি ধনুকের মত বাঁকিয়া যাইবে। ধনুকের পিঠের দিকে পিতল এবং ভিতরের দিকে লোহা থাকিবে।

যদি যুগ্মদণ্ডটিকে বরফ জল ঢালিয়া ঠাণ্ডা করা হয়, তাহা হইলে পিতলের দণ্ডটির দৈর্ঘ্য হ্রাস, লোহা অপেক্ষা বেশী হইবে। ফলে দণ্ডটি বাঁকিয়া যাইবে। এই ক্ষেত্রে ধনুকের পিঠের দিকে লোহা এবং ভিতরের দিকে পিতল থাকিবে।

যুগ্মদণ্ডের ব্যবহারিক প্রয়োগঃ ঘড়িতে যে পেণ্ডুলাম থাকে, তাহার দৈর্ঘ্য হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ঘড়ি ধীরে বা দ্রুত চলে। হাত ঘড়িতে পেণ্ডুলামের
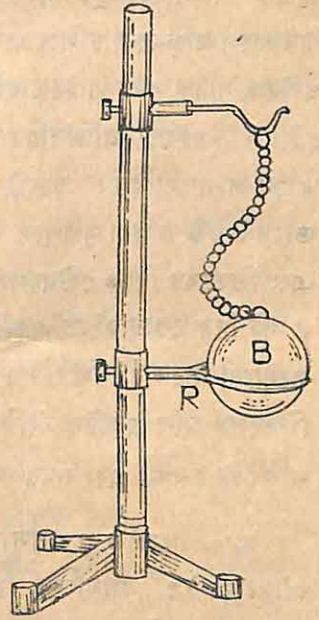
পরিবর্তে একটি চক্র থাকে। এই চক্রের ব্যাসার্ধের উপর ঘড়ির সময় নির্ভর করে। ব্যাসার্ধের হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে ঘড়ি দ্রুত বা ধীরে চলিবে। সুতরাং শীতকালে ঘড়ি দ্রুত চলিবে এবং গ্রীষ্মকালে ধীরে চলিবে। শীত বা গ্রীষ্মে ঘড়িতে সঠিক সময় পাইতে হইলে ইহার চক্রের ব্যাসার্ধ সর্বদা সমান রাখিতে হইবে। এইজন্য প্রতিবিহিত চক্র প্রস্তুত করা হয়। যুগ্মদণ্ডের ধর্মকে এই কাজে লাগানো হয়। চক্রটি তিনটি ভাগে ভাগ করা থাকে। প্রত্যেকটি ভাগে একটি করিয়া যুগ্মপাত থাকে। এই চক্রের বাহিরের দিকে পিতল এবং ভিতরের দিকে স্টেনলেস্ স্টীলের পাত থাকে। প্রত্যেকটি যুগ্মপাতের একটি দিক কেন্দ্র হইতে একটি দণ্ডের সহিত যুক্ত এবং অপর দিকে একটি স্ক্রু লাগানো থাকে। পিতলের দৈর্ঘ্য প্রসারণ অধিক বলিয়া গ্রীষ্মকালে চক্রের পিতলের অংশ একদিক বাঁকিয়া ভিতরে ঢুকিয়া যায়। ফলে ব্যাসার্ধের কোন পরিবর্তন হয় না এবং সময় কাল ঠিক থাকে।

৪.৮. ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন (Physical and chemical change): আমাদের চারিদিকের বস্তুজগতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। পর্বতের উপরের কঠিন তুষার গলিয়া জল হইতেছে ; নদী ও সমুদ্রের জল সূর্যের উত্তাপে বাষ্প হইয়া মেঘ সৃষ্টি করিতেছে এবং মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতেছে ; এইরূপ বহু পরিবর্তন প্রকৃতিতে আপনা আপনি হয়। আবার আমরা নিজেরাও অহরহ শক্তির সাহায্যে বস্তুর নানাপ্রকার পরিবর্তন সাধন করি। যেমন, রান্নাঘরে কয়লা পুড়িয়া ছাই হইতেছে। মোটর গাড়ীতে পেট্রল পুড়িয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড ও আরও অনেক গ্যাসীয় পদার্থ হইতেছে। ফুটন্ত জলে চাউল ভাতে পরিণত হইতেছে। এইরকম অসংখ্য পরিবর্তন বস্তুজগতের স্বাভাবিক ঘটনা।

একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বস্তুজগতে প্রতিনিয়ত যে অসংখ্য পরিবর্তন ঘটিতেছে উহার সব একরকম নয়। বস্তুর এইসব পরিবর্তনকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয় :—(১) ভৌত পরিবর্তন এবং (২) রাসায়নিক পরিবর্তন।

যে পরিবর্তনে পদার্থের শুধু বাহ্যিক পরিবর্তনই হয়, কিন্তু যে সকল অণু

দ্বারা পদার্থটি গঠিত উহাদের কোন পরিবর্তন হয় না, তাহাকে ভৌত পরিবর্তন বলে।

উদাহরণ :—(১) বরফকে উত্তপ্ত করিলে জলে পরিণত হয়, আরও উত্তপ্ত করিলে বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পকে শীতল করিলেই আবার জল ও পরে বরফ পাওয়া যাইবে। বরফ, জল ও বাষ্প এই তিন অবস্থার পরিবর্তনেই পদার্থের ভৌতধর্ম যথা, ঘনত্ব, আয়তন, বর্ণ, তাপমাত্রা প্রভৃতির পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু জল, বাষ্প ও বরফের অণুগুলি একই রহিয়াছে। বস্তুতঃ, ইহাতে পদার্থের মূল গঠনে কোন পরিবর্তন হয় নাই।

(২) বিদ্যুৎ-প্রবাহের ফলে বৈদ্যুতিক বাল্‌বের ভিতরের সরু তারটি আলো বিকিরণ করিতে থাকে। যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সেই তারটি তখন আর আলো দিতে সক্ষম হয় না, এই যে পরিবর্তন যাহাতে তারটি যে সকল অণুদ্বারা গঠিত তাহাদের কোন পরিবর্তন হয় নাই ; কেবল উহার বাহ্যিক অবস্থাগত ধর্মের ব্যতিক্রম হইয়াছে মাত্র।

যে পরিবর্তনে পদার্থের অণুগুলির পরিবর্তন হইয়া নূতন পদার্থে রূপান্তরিত হয় তাহাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে।

উদাহরণ :—(১) কেরোসিন তেল পুড়িয়া যখন আলো বিকিরণ করে তখন উহা মুখ্যতঃ দুইটি নূতন পদার্থে পরিণতি লাভ করে—কার্বন ডাইঅক্সাইড ও বাষ্প। সুতরাং কেরোসিন তেল পোড়ার সময় রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে।

(২) প্রজ্বলনের ফলে কঠিন মোম গলিয়া তরল মোমে পরিণত হয়।

তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তরল মোম অক্সিজেনের সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া করিয়া প্রথমে কার্বন মন-

অক্সাইড এবং পরে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি নূতন যৌগ গঠন করে এবং সেই সঙ্গে আলোক শক্তির বিকিরণ ঘটে। ইহা একটি রাসায়নিক পরিবর্তন। দহন শেষে মোমবাতিটির কিছুই অবশিষ্ট থাকে না দেখিয়া পদার্থটি সম্পূর্ণ বিনাশ হইল মনে করা ভুল হইবে। কারণ এক্ষেত্রে সমগ্র পদার্থটির অন্যরূপে রূপান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়।
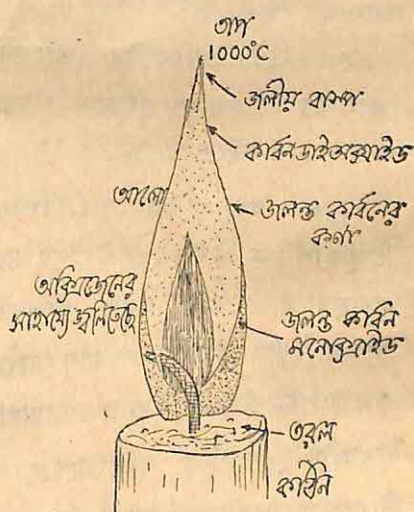
ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা

ভৌত পরিবর্তন	রাসায়নিক পরিবর্তন
১। পদার্থের অণুগুলির গঠন ঠিকই থাকে কেবলমাত্র পদার্থের অবস্থার রূপান্তর ঘটে। কোন নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় না।	১। পদার্থের অণুগুলির গঠন পরিবর্তিত হয়, ফলে ধর্মের আমূল পরিবর্তন ঘটে।
২। এই পরিবর্তন অস্থায়ী, সহজেই পরিবর্তিত পদার্থকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায়।	২। এই পরিবর্তন স্থায়ী এবং পরিবর্তিত পদার্থকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না।
৩। এই পরিবর্তনে পদার্থের ওজন বাড়েও না কমেও না।	৩। এই পরিবর্তনে পদার্থের ওজন হয় কমিবে নয় বাড়িবে।
৪। এই পরিবর্তনে তাপের কোন উদ্ভব বা শোষণ হইতেও পারে আবার নাও হইতে পারে।	৪। এই পরিবর্তনে তাপের উদ্ভব বা শোষণ হইবেই।

৪.৯. অণু ও পরমাণু (Atoms and molecules) : প্রাচীন কালে হিন্দু দার্শনিক কণাদ ও খ্রীস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে গ্রীক দার্শনিক ডেমোক্রিটিসের মতানুসারে, প্রত্যেক পদার্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দ্বারা গঠিত। তাঁহারা ইহার নাম দেন পরমাণু (atom)। ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ বৈজ্ঞানিক জন ডালটন তাঁহার বিখ্যাত পারমাণবিক তত্ত্ব প্রচার করেন। ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে ইতালীয় বৈজ্ঞানিক অ্যাভোগেড্রো ডালটনের তত্ত্বকে সংশোধন করেন। তাঁহার মতানুসারে পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

যথা—(১) অণু (molecule) (২) পরমাণু (atom)। পদার্থের নিজস্ব ধর্ম বজায় রাখিয়া পদার্থের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য কণাগুলিকে বলা হয় অণু। কিন্তু রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পদার্থের যে ক্ষুদ্রতম কণা অংশ গ্রহণ করে তাহাকে বলা হয় পরমাণু। প্রত্যেক অণু এক বা একাধিক পরমাণু দ্বারা গঠিত। মৌলিক পদার্থের অণুগুলি একজাতীয় এক বা একাধিক পরমাণু সংযোগে গঠিত, কিন্তু যৌগিক পদার্থের অণুগুলি বিভিন্ন জাতীয় দুই বা ততোধিক পরমাণু সংযোগে গঠিত।

পঞ্চম অধ্যায়

মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation)

৫.১. মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) : প্রাচীন ভারতে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর আচার্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জ্যোতির্বিদ্যা ও গ্রহ-উপগ্রহ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন।—দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দু জ্যোতির্বিদ ভাস্কর আচার্য তাঁহার 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' নামক গ্রন্থে মাধ্যাকর্ষণ ও অভিকর্ষ সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেন, কোন বস্তু যখন পৃথিবীর দিকে পড়ে, তখন পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যই পড়ে। গ্রহ বা উপগ্রহগুলি যে কক্ষপথে ঘোরে তাহার কারণও পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ।

১৭শ শতাব্দীর প্রথম দিকে জোয়ান কেপলার (Joan Kepler) ঐ একই তথ্য আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, সূর্যকে নাভিতে রাখিয়া বিভিন্ন গ্রহগুলি ডিম্বাকার কক্ষপথে আবর্তিত হয়।

কেপলারের সূত্র হইতে অনুপ্রাণিত হইয়া স্যার আইজ্যাক্ নিউটন ১৭শ শতাব্দীর শেষের দিকে তাঁহার বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কোন বস্তুকে উপর হইতে ফেলিলে পৃথিবীর দিকে পড়ে। পৃথিবী সকল বস্তুকেই তাহার নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

কেপলারের সূত্রগুলি প্রমাণ করিতে যাইয়া তিনি উপলব্ধি করেন যে, এই আকর্ষণ শুধু পৃথিবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে, মহাশূন্যের যে কোন তুইটি বস্তুর ভিতরে এই আকর্ষণ বর্তমান। এই আকর্ষণকে তিনি মাধ্যাকর্ষণ নাম দেন।

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রঃ বিশ্বের যে কোন তুইটি বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণের মান বস্তু তুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং বস্তু তুইটির মধ্যবর্তী দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক।

৫.২. অভিকর্ষ (Gravity)ঃ মহাশূন্যের যে কোন তুইটি বস্তুর ভিতর আকর্ষণ বলকে মাধ্যাকর্ষণ বলা হয়। কিন্তু পৃথিবী ও পৃথিবীর উপরিস্থ বা নিকটবর্তী যে কোন পার্থিব বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বলকে অভিকর্ষ বলে। যে কোন বস্তুকে মাটি হইতে উঁচুতে তুলিয়া ছাড়িয়া দিলে, পৃথিবীর আকর্ষণ বা অভিকর্ষের জন্য ইহা মাটির দিকে পড়িবে। যে কোন বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করিলে ইহার গতি বৃদ্ধি পায়। ফলে, ইহার উপর একটি ত্বরণ সৃষ্টি হয়। গতি বৃদ্ধির হারকে ত্বরণ বলে। পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্য যে ত্বরণ সৃষ্টি হইল তাহাকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলা হয়। ইহার মান ৯৮১ সেঃ মিঃ / (সেকেণ্ড)^{২} বা ৩২ ফুট / (সেকেণ্ড)^{২}। নিউটনের সূত্র হইতে দেখিতে পাই যে, মাধ্যাকর্ষণ ও অভিকর্ষ বস্তু তুইটির দূরত্বের উপর নির্ভর করে। দূরত্ব যত বেশী হয়, অভিকর্ষ বল তত কম হয়। সুতরাং পৃথিবী পৃষ্ঠ হইতে যত উঁচুতে উঠা যায়, পৃথিবী হইতে বস্তুর দূরত্ব তত বৃদ্ধি পায় এবং অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কম হয়। সেইজন্য কলিকাতা হইতে দার্জিলিঙে অভিকর্ষজ বল ও ত্বরণের মান কম, কারণ দার্জিলিঙ হিমালয়ের উপর অবস্থিত। আবার পৃথিবী সম্পূর্ণ গোলাকার নহে। ইহা উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা। সেইজন্য বিষুবরেখায় পৃথিবীর ব্যাস অধিক, কিন্তু তুই মেরুর মধ্যবর্তী ব্যাস অনেক কম। সেইজন্য বিষুবরেখা হইতে যতই মেরুর দিকে যাওয়া যায়, ততই পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব কমিয়া যায়, সুতরাং অভিকর্ষজ বলের মান বৃদ্ধি পায়। এই কারণে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে অভিকর্ষজ বল ও ত্বরণের মান

অধিক। অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর বস্তুর ওজন নির্ভর করে। অভিকর্ষজ ত্বরণ কম হইলে, বস্তুর ওজনও কম হইবে।

৫.৩. চন্দ্রের অভিকর্ষ (Moon's gravitation): চন্দ্র আমাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী। ইহা পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। ইহার ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ০·২৭ অংশ এবং চন্দ্রের ভর, পৃথিবীর ভরের ৮২ ভাগ। যেহেতু চন্দ্র, পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র, সেইজন্য ইহার অভিকর্ষ বা আকর্ষণ পৃথিবীর অভিকর্ষ অপেক্ষা কম হইবে। নিউটনের সূত্র হইতে জানি যে, মাধ্যাকর্ষণ বল বস্তু দুইটির ভরের গুণফলের সমানুপাতিক। আবার চন্দ্রের ভর, পৃথিবীর ভরের ৮২ ভাগ। অতএব চন্দ্রের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের ৮২ ভাগ হইবে। পুনরায় মাধ্যাকর্ষণ বল বস্তুর দূরত্বের বর্গের সমানুপাতিক। যেহেতু চন্দ্রের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ০·২৭ অংশ। সুতরাং চন্দ্রের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের $(\cdot ২৭)^২$ অংশ হইবে।

উভয় ফল এক করিলে চন্দ্রের অভিকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের $৮২ \times (\cdot ২৭)^২$ বা $\frac{১}{৬}$ অংশ। সুতরাং পৃথিবীতে কোন বস্তুর ওজন ১ কেজি হইলে, চন্দ্রে সেই বস্তুর ওজন $\frac{১}{৬}$ কেজি বা ১৬৭ গ্রাম হইবে। পৃথিবীতে কোন লোক যদি ১ মিটার লাফাইতে পারে, সেই একই লোক চন্দ্রপৃষ্ঠে অনায়াসে ৬ মিটার লাফাইতে পারিবে।

৫.৪. পতনশীল বস্তুর সূত্র (Laws of falling bodies): কোন বস্তুকে উঁচু হইতে ফেলিলে, পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্য সোজা নীচের দিকে পড়ে। প্রাচীনকালে পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে, ভারী বস্তু, হাল্কা বস্তু অপেক্ষা কম সময়ে মাটিতে পড়িবে, যদি তাহাদের একই উচ্চতা হইতে ফেলা হয়। গ্যালিলিও সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে,
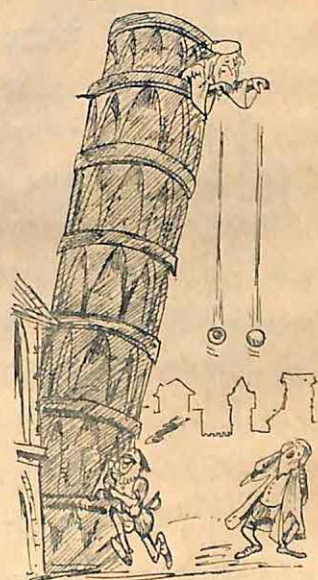
সকল বস্তুই পৃথিবীর আকর্ষণে একই সময়ে মাটি স্পর্শ করিবে। তিনি পিসা শহরের ১৮০ ফুট উঁচু হেলানো মিনারের উপর হইতে দুইটি বস্তু, একটি লোহার বল ও আর একটি কাঠের বল ফেলিয়া প্রমাণ করেন যে, সকল বস্তুই একই সময়ে মাটিতে পড়ে। বায়ুর বাধার জন্য সময়ের সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। ইহা হইতে তিনি তাঁহার বিখ্যাত পড়ন্ত বস্তুর সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন।

সূত্রাবলী :—

(১) স্থির অবস্থা হইতে বায়ুশূন্য স্থানে সকল বস্তু সমান দ্রুততায় নীচে পড়ে।

(২) স্থির অবস্থা হইতে বায়ুশূন্য স্থানে পতনের সময়, বস্তুর যে কোন সময়ের বেগ, তাহা পতনকালীন সময়ের সমানুপাতিক।

(৩) স্থির অবস্থা হইতে বায়ুশূন্য স্থানে পতনের সময়, বস্তু যে কোন সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহা পতনকালীন সময়ের বর্গের সমানুপাতিক।
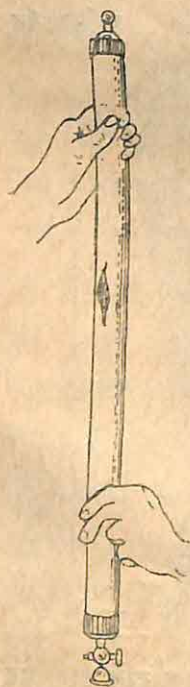
প্রথম সূত্রটি গ্যালিলিও পিসার হেলানো মিনার পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করেন। এই সূত্রটি পরীক্ষাগারে স্যার আইজ্যাক নিউটন গিনি ও পালক পরীক্ষা দ্বারা ইহার সত্যতা নির্ধারণ করেন।

একটি দীর্ঘ মোটা কাচ নল লওয়া হইল। ইহার দুই মুখ পিতলের ছিপি দ্বারা বন্ধ। একটি ছিপিতে প্যাঁচকলযুক্ত নল লাগানো আছে। একটি গিনি মুদ্রা ও একটি পাখির পালক ঐ নলের মধ্যে রাখিয়া ছিপি বন্ধ করা হইল। নলটি বায়ুপূর্ণ থাকাকালীন অবস্থায় ইহাকে উল্টাইয়া ধরিলে, গিনি, পালকের অপেক্ষা দ্রুত পড়ে। নলের মধ্যকার বায়ুর জন্য পালকের পড়িতে দেরী হয়। এখন প্যাঁচকল খুলিয়া নলটিকে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্রের সহিত যোগ করিয়া বায়ু অপসারণ করা

হইল। প্রায় বায়ুশূন্য হইবার পর নলটিকে হঠাৎ উল্টাইয়া দিলে দেখা যায় যে, গিনি ও পালক একই সময়ে নীচে পড়ে। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, সকল বস্তুই পড়িবার সময় একই লয় এবং পৃথিবীর আকর্ষণজনিত ত্বরণ সকল বস্তুর ক্ষেত্রেই সমান।

দ্বিতীয় সূত্র হইতে পাই যে, প্রথম সেকেণ্ডের পর বস্তু যদি ৩২ ফুট /সেকেণ্ড গতি লাভ করে, তাহা হইলে দ্বিতীয় সেকেণ্ডের পর গতি উৎপন্ন হয় ৬৪ ফুট/সেকেণ্ড এবং তৃতীয় সেকেণ্ডের পর গতি হয় ৯৬ ফুট/সেকেণ্ড।

তৃতীয় সূত্র হইতে পাই যে, প্রথম সেকেণ্ডে বস্তু যদি ১৬ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহা হইলে প্রথম দুই সেকেণ্ডে ৬৪ ফুট দূরত্ব এবং তিন সেকেণ্ডে ১৪৪ ফুট দূরত্ব অতিক্রম করিবে।

৫.৫. স্যার আইজ্যাক নিউটনের জীবনী ঃ ১৬৪ খ্রীস্টাব্দে বড়দিনের দিন ইংলণ্ডের লিঙ্কনসায়ারের উল্‌সথ্‌প নামক স্থানে নিউটনের জন্ম হয়।

দুই বৎসর বয়স হইতে তিনি ঠাকুর্দার নিকট মানুষ হন। তিনি গ্রান্থাস গ্রামার বিদ্যালয়ে শিক্ষা-লাভ করেন। ১৫ বৎসর বয়সে তাঁহাকে বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া কৃষিবিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। কিন্তু পড়াশুনায় অত্যধিক আগ্রহ থাকায় তাঁহাকে পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় এবং ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তী ছয় বৎসর তিনি বিভিন্ন গবেষণায় রত থাকেন। জোয়ান কেপলারের গ্রহ-সংক্রান্ত তথ্য হইতে তিনি স্থির নিশ্চিত হন যে, গ্রহগুলি ও সূর্যের মধ্যে বা গ্রহ ও তাহার চন্দ্রের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন আকর্ষণ বল ক্রিয়া করে, যাহার জন্য গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে ঘোরে বা চন্দ্র গ্রহের চারিদিকে ঘোরে। এইসময় একদিন তিনি একটি আপেল

গাছের নীচে গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ একটি আপেল গাছ হইতে খসিয়া মাটিতে পড়িল। আপেলের এই পতন দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল যে, পৃথিবী ও তাহার নিকটবর্তী পার্থিব বস্তুর ভিতর একটি আকর্ষণ বল বর্তমান। এই আকর্ষণের জন্যই আপেল খসিয়া মাটিতে পড়িল, সোজা উপরে উঠিল না। কেপলারের সূত্র ও আপেলের পতন দেখিয়া তিনি তাঁহার বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সময় গ্যালিলিও পড়ন্ত বস্তুর সূত্রাবলী আবিষ্কার করেন। গ্যালিলিও আবিষ্কার করেন যে, সকল বস্তু পৃথিবীর আকর্ষণে একই দ্রুততায় মাটিতে পড়ে। নিউটন গিনি ও পালক পরীক্ষা দ্বারা এই সূত্রের সত্যতা নিরূপণ করেন।

১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে প্লেগ রোগের মহামারী দেখা দেয় এবং তিনি কেম্ব্রিজ হইতে উল্সথ্রূপে চলিয়া আসিতে বাধ্য হন। মাধ্যাকর্ষণ সূত্র হইতে গ্রহ-উপগ্রহগুলির গতিপথ ও সময়কাল নির্ণয় করিবার সময় তিনি গণিত-শাস্ত্রের এই বিষয়ে স্বল্পতা দেখিয়া স্থির করেন যে, গণিতশাস্ত্রের আশু উন্নতি প্রয়োজন। তিনি কালকুলাস নামে গণিতশাস্ত্রের তথ্য আবিষ্কার করেন এবং গতিবিদ্যার (Dynamics) উন্নতি সাধন করেন। তিনি গতিবিদ্যার উপর তিনটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রগুলির উপর সম্পূর্ণ গতিবিদ্যা নির্ভরশীল। এই সকল আবিষ্কারের সময় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক এড্মণ্ড হালের নিকট হইতে তিনি প্রচুর সাহায্য পান। তিনি তাঁহার আবিষ্কৃত সকল তথ্য 'প্রিন্সিপিয়া' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে, জুলাই মাসে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

ইহার পর হইতেই তিনি আলোক বিজ্ঞানের গবেষণায় রত হন। তিনি প্রমাণ করেন যে, সাদা আলো সাতটি বিভিন্ন বর্ণের আলোর সমষ্টি। একটি তিন কোনা কাচের (প্রিজমের) মধ্য দিয়া যাইবার সময় সাদা আলো সাতটি বর্ণে ভাগ হইয়া যায়। রামধনুর সাতটি রঙের কারণও তাহাই। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, আলো একপ্রকার কণিকার সমষ্টি। উৎস হইতে কণিকাগুলি পরপর বাহির হইয়া আসে। বিভিন্ন বর্ণের আলোর

কণিকাগুলি আকারে বিভিন্ন। পরে আলোর এই তথ্য বাতিল হইয়া যায়। ১৬৬৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রতিফলনের সাহায্যে একটি দূরবীণ গঠন করেন। তাপ সম্বন্ধে তিনি একটি তথ্য আবিষ্কার করেন। বিভিন্ন তরলকে উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়া দিলে ইহারা ধীরে ধীরে শীতল হয়। সকল তরলের তাপমাত্রা হ্রাসের হার সমান। ইহাকে নিউটনের নিয়ম (Law of cooling) বলে। শব্দ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অপরিসীম। যে কোন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের মধ্য দিয়া যে কোন তরঙ্গের বেগ গণিতের সাহায্যে একটি সূত্রে গ্রথিত করেন। এই সূত্রের সাহায্যে তিনি বায়ুর মধ্য দিয়া শব্দ-তরঙ্গের বেগ নির্ণয় করেন। গণিতের সাহায্যে নির্ণীত শব্দ-তরঙ্গের বেগ ও পরীক্ষালব্ধ শব্দ-তরঙ্গের বেগ বিভিন্ন হওয়ায়, পরে নিউটনের এই সূত্র কিঞ্চিৎ সংশোধিত হয়।

১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে নিউটন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটির সভ্য নিযুক্ত হন এবং ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে মহারানী অ্যান কর্তৃক 'নাইট উপাধি'তে ভূষিত হন। ইহার পর হইতেই নিউটন স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হন। ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে ২০শে মার্চ, ৮৫ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং ওয়েষ্টমিনষ্টার সমাধিতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। নিউটনকে সর্বকালীন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হিসাবে গণ্য করা হয়।

৫.৬. জোয়ার ও ভাঁটা (Tides): সূর্য ও চন্দ্র উভয়ের সহিত পৃথিবীর আকর্ষণ বল আছে। সূর্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে বলিয়া ইহার মাধ্যাকর্ষণ বল খুব কম। কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর খুব কাছে থাকায় ইহার মাধ্যাকর্ষণ বল অনেক বেশী। চন্দ্রের এই আকর্ষণের জন্যই জোয়ার ও ভাঁটা হয়। চন্দ্র পৃথিবীর যে দিকে থাকে সেই দিকের সমুদ্রের জল চন্দ্রের আকর্ষণে ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠে এবং বেগে নদীতে প্রবেশ করে। ইহাকেই জোয়ার বলে। যে অংশে জোয়ার হইল, সেখানে সমুদ্রের জল বাড়িয়া যায়, সুতরাং অন্য এক অংশে সমুদ্রের জল কমিয়া যায় এবং নদী হইতে জল সমুদ্রে প্রবেশ করে, ইহাকেই ভাঁটা বলে। জোয়ারের সময় নদীতে অতিরিক্ত জল প্রবেশ

করে এবং ভাঁটার সময় সেই অতিরিক্ত জল বাহির হইয়া যায়। সেইজন্য সমুদ্র তীরের নিকটে নদীর জল লোনা। অমাবস্যায় সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর একই দিকে থাকে, সেইজন্য উভয়ের আকর্ষণে সমুদ্রের জলে প্রবল জলোচ্ছ্বাস দেখা যায় এবং নদীতে প্রবলবেগে জল প্রবেশ করে। ইহাকে ভরা কোটাল বলে। আবার পূর্ণিমায় সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে, সেইজন্য এই সময়কার জোয়ারকে মরা কোটাল বলে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার জোয়ারকে বান বলে। জোয়ার ও ভাঁটার জন্য নদীখাত গভীর হয় এবং সেইজন্য নদীপথে জাহাজের যাতায়াতের পথ সুগম হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয়।
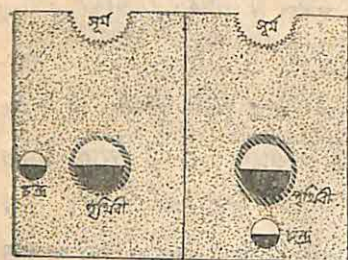
ষষ্ঠ অধ্যায়

সৌরজগৎ ও আলো (Solar System and Light)

৬.১. মহাকবি বলিয়া গিয়াছেন—"বিচিত্র এ পৃথিবীর কতটুকু জানি"—সত্যি জানি অতি সামান্যই। কিন্তু তাহার অপেক্ষা অতি সামান্যই জানি পৃথিবীর উপরকার মহাশূন্যকে, যাহার শুরু ঠিক মাটির বুক হইতেই, কিন্তু যাহার শেষ বলিয়া কিছু নাই।

মহাশূন্য নামটি কে বা কেন দিয়াছিলেন, তাহা ঠিক অনুমেয় নয়। কারণ আধুনিক শক্তিশালী টেলিস্কোপ বা দূরবীক্ষণ নামক যন্ত্রের সাহায্যে আমরা জানিতে পারিয়াছি, পৃথিবীর উপরকার এই মহাশূন্য কিন্তু শূন্য নয়।

শূন্যের ভিতর যে সকল বস্তু সর্বব্যাপী হইয়া রহিয়াছে, উহারা হইল নানা জাতীয় গ্যাস। যাহাকে আমরা বায়ুমণ্ডল বলি।

বিজ্ঞানীরা এই বায়ুমণ্ডলকে চারিটি স্তরে ভাগ করিয়াছেন। মাটির ঠিক উপর হইতে দশ মাইল উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের নাম ট্রপোস্ফিয়ার। আকাশে সাদা ও কালো যে পুঞ্জীভূত মেঘরাশি দেখা যায়, উহারা সকলেই ট্রপোস্ফিয়ারের মধ্যেই চলাফেরা করে। অর্থাৎ দশ মাইল ছাড়াইয়া গেলে আর মেঘ দেখিতে পাওয়া যায় না। আবহাওয়া বলিতে কখনো গরম, ঠাণ্ডা, কখনো থমথমে, কখনো প্রচণ্ড ঝড় বোঝায়। ইহারাও ট্রপোস্ফিয়ারেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ট্রপোস্ফিয়ার অতিক্রম করিলে ঝড়-বৃষ্টির অস্তিত্ব নাই।

মহাশূন্যের দ্বিতীয় স্তরকে বলা হয় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। দশ মাইলের উপর হইতে পঞ্চাশ মাইল সীমারেখা পর্যন্ত ইহা বিস্তৃত। ট্রপোস্ফিয়ারের তুলনায় এই স্তরে বায়ুর পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অনেক অল্প। অক্সিজেনের অনুপাত অনেক কম, ইহার ফলে মানুষের পক্ষে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে নিঃশ্বাস লওয়া কষ্টকর।
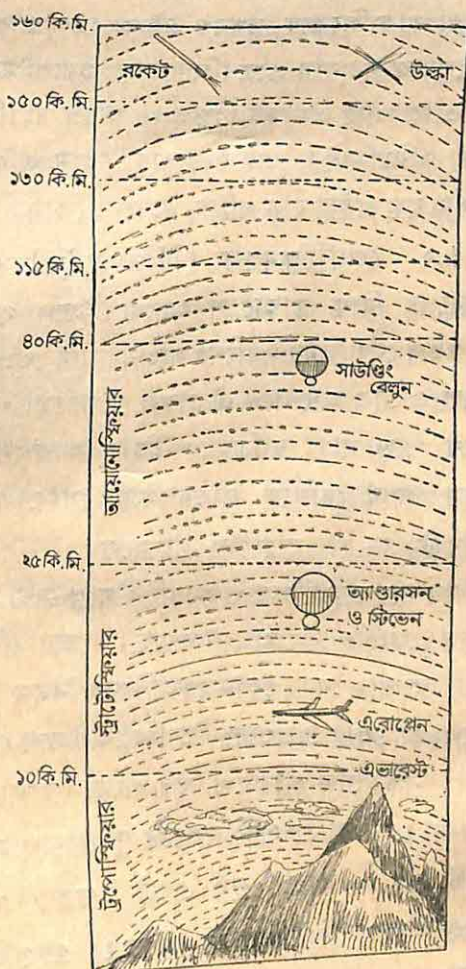
অর্থাৎ বিমানে চড়িয়া এই স্তরে আসিতে হইলে সঙ্গে অক্সিজেন লইয়া আসিতে হয়।

স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপরের স্তরকে আয়োনোস্ফিয়ার বলে। ইহা পঞ্চাশ মাইলের উপর হইতে ছয়শো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে বাতাস নাই বলিলেই চলে। অক্সিজেন সঙ্গে না থাকিলে মানুষ এই স্তরে এক মিনিটও বাঁচিতে পারে না। ইহা ছাড়া, এই স্তরের আর এক বৈশিষ্ট্য, সূর্য যখন জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে, তখনও এই স্তরের শূন্য কালচে রংয়ের।

শেষ স্তরের নাম এক্সোস্ফিয়ার। ছয়শো মাইলের উপর হইতে মহাবিশ্বের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এই স্তর বিস্তৃত। অবশ্য মহাবিশ্বের শেষ আছে বলিয়া যদি কল্পনা করিয়া লই। এই স্তরে বায়ুর কোন অস্তিত্ব নাই। এমনকি যে সকল গ্যাসীয় বস্তু লইয়া বায়ু গঠিত, উহাদের কোনটারই এই স্তরে অস্তিত্ব নাই।

৬.২. **জ্যোতিষ্কমণ্ডল (Heavenly bodies) :** রাত্রিকালে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকাইলে অসংখ্য উজ্জ্বল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জ্যোতির্ময় পদার্থের সাধারণ নাম জ্যোতিষ্ক। দিনের বেলায় সূর্যের উজ্জ্বল ও তীব্র আলোকে ঐ সকল জ্যোতির্ময় পদার্থ বা জ্যোতিষ্করা আমাদের চোখে পড়ে না। রাত্রির পরিষ্কার আকাশে চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য যে সব উজ্জ্বল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইগুলির অধিকাংশই নক্ষত্র ; অল্প কয়েকটি আছে, যাহাদের গ্রহ বলে।

দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ ও আধুনিক যন্ত্রে দেখা যায় কতকগুলি জ্যোতিষ্কের নিজস্ব জ্যোতি বা আলো আছে। জ্যোতির্বিদ্যায় তাহাদিগকে নক্ষত্র বলা হয়। আবার কোন কোন জ্যোতিষ্কের নিজস্ব আলো নাই। অন্য নক্ষত্রের আলো প্রতিফলিত হওয়ায় উহাদিগকে উজ্জ্বল দেখায়। ইহাদিগকে গ্রহ বলা হয়। নক্ষত্রগুলি আকাশে স্থির থাকে, পরস্পরের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করে না। কিন্তু গ্রহগুলি নক্ষত্রের তুলনায় স্থান পরিবর্তন করে। পৃথিবীও একটি গ্রহ। আবার সূর্য একটি নক্ষত্র। কারণ সূর্যের নিকট হইতে যে প্রচণ্ড আলো পাই উহা সূর্যের নিজস্ব। গ্রহগুলি সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। সেইজন্য আকাশে গ্রহগুলিকে একস্থান হইতে অন্য স্থানে সরিয়া যাইতে দেখা

যায়। গ্রহ বলিতে আমরা এখনও পর্যন্ত শুধু সৌরমণ্ডলের বা সৌরজগতের গ্রহই বুঝি, কারণ সৌরমণ্ডলের বাহিরের কোন গ্রহ সম্বন্ধে কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান-বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত দিতে সক্ষম হয় নাই। পৃথিবী সমেত সৌরমণ্ডলের গ্রহের সংখ্যা নয়টি। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন এবং প্লুটো। এই নয়টি গ্রহের আয়তনের তুলনা করিলে দেখা যায়, বৃহস্পতি বৃহত্তম। তাহার পর যথাক্রমে—শনি, নেপচুন, ইউরেনাস, পৃথিবী, শুক্র, মঙ্গল ও বুধ। ইহাদের কাহারও নিজস্ব আলো নাই। সূর্যের আলোক এই গ্রহগুলিকে আলোকিত করে। সেই আলোক আমাদের চোখে প্রতিফলিত হইয়া আসে বলিয়া আমরা উহাদিগকে দেখিতে পাই। রাত্রের আকাশে গ্রহ ও নক্ষত্র দেখিয়া চিনিবার উপায় গ্রহগুলির আলোক স্থির এবং উজ্জ্বল। আর নক্ষত্রের আলো ম্লান, উজ্জ্বল নয় ও জ্বলে মিটমিট করিয়া।

৬.৩. সৌরজগৎ (Solar System): সূর্যের আকর্ষণে নিয়ন্ত্রিত হইয়া যে সকল গ্রহ ও উপগ্রহ তাহাকে কেন্দ্র করিয়া স্ব-স্ব কক্ষপথে ঘুরিতেছে তাহাদিগকে লইয়া সূর্য মণ্ডলাধিপতিরূপে অসীম আকাশের এক অতি ক্ষুদ্র অংশে বিরাজ করিতেছে। সূর্যের এই রাজ্যটির নাম সৌরজগৎ। আমাদের পৃথিবী এই সৌরজগতের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশমাত্র।

সূর্য (Sun): সূর্যকে আমরা সব চাইতে বেশী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসাবে দেখিতে পাই। সূর্য পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটতম নক্ষত্র। পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ২০ লক্ষ মাইল। আর ইহার পরই যে নক্ষত্রটি সব চাইতে কাছের, তাহার নাম প্রক্সিম সেণ্টোরি। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব হইল ২৫ লক্ষ কোটি মাইল। অন্য নক্ষত্রগুলি আরো অনেক দূরে।

সূর্য হইতে আমরা আলোক ও তাপ পাই। এই আলোক ও তাপ আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য।

সূর্যের বাহিরের তাপমাত্রা ৭০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। যতই সূর্যের কেন্দ্রের দিকে যাওয়া যাইবে; ততই তাপমাত্রা বাড়িবে। কেন্দ্রের তাপমাত্রা ২ কোটি সেন্টিগ্রেড ডিগ্রীর অপেক্ষাও বেশী। জল ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়

ফুটিতে থাকে। লোহা ১২০০° হইতে ১৫০০° সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী উত্তাপে গলিয়া তরল হয়। কাজেই ২ কোটি সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী তাপমাত্রা সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার
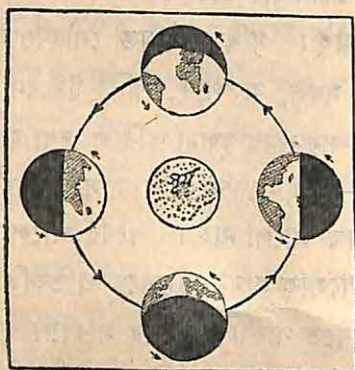
ধারণা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে সূর্য একটি গ্যাসের জ্বলন্ত পিণ্ড। সূর্য পৃথিবী হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া সূর্যের তাপের সামান্য অংশই পৃথিবীতে আসিয়া পৌছায় এবং এই তাপ আমরা সহ্য করিতে পারি।

সূর্যের কেন্দ্রের এই প্রচণ্ড শক্তি, এই "অন্তবিহীন অগ্নিধারার" উৎস কোথায়? সাধারণ বুদ্ধিতে প্রথমেই মনে হয়, কয়লা যেমন জ্বলে, অর্থাৎ অক্সিজেনের সঙ্গে কয়লার যেমন রাসায়নিক সংমিশ্রণ হয়, তেমনি সূর্যের বস্তুও হয়তো এইরূপ কোন দহন-ক্রিয়ার সাহায্যে শক্তি উৎপাদন করে। এই অনুমান প্রথমেই বাতিল করিতে হয় এই কারণে যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা সাধারণ দহন-ক্রিয়ার সাহায্যে ২ কোটি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বা কয়লার চেয়ে ১০ লক্ষ গুণ বেশী তাপশক্তি উৎপন্ন করিতে পারে। তাই আধুনিক মতে, সূর্যের শক্তির উৎস হইল পারমাণবিক প্রক্রিয়া বা আরও ঠিকভাবে বলিতে গেলে পরমাণু-কেন্দ্রক সম্পর্কিত প্রক্রিয়া। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতত্ত্ব অনুসারে, বস্তু ও শক্তি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন দুইটি সত্তা নয়—বিশেষ ক্ষেত্রে বস্তু শক্তিতে এবং শক্তি বস্তুতে রূপান্তরিত হইতে পারে।

সূর্যের মধ্যস্থিত কিছু বস্তু প্রতিনিয়তই একপ্রকার শক্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে, উহার নাম গামারশ্মি। ঐ গামারশ্মি সূর্যের কেন্দ্র হইতে নির্গত হইয়া সূর্যের বহির্মণ্ডলে আসিয়া পুনরায় রূপান্তরিত হয় আলোক-রশ্মি, তাপ-রশ্মি এবং অতি-বেগুনী রশ্মি ইত্যাদিতে। সূর্য এইভাবে যে শক্তি বিকিরণ করিতেছে, উহার ২২ কোটি ভাগের একভাগ মাত্র আসিয়া পড়িতেছে সূর্যের নয়টি গ্রহ এবং উহাদের উপগ্রহগুলিতে। বাকী শক্তি ছুটিয়া চলিয়াছে অবিরত

সূর্য
বুধ
শুক্র
পৃথিবী
মঙ্গল
বৃহস্পতি
শনি
ইউরেনাস
নেপচুন
প্লুটো
বুধ
শুক্র
পৃথিবী
মঙ্গল
বৃহস্পতি
শনি
ইউরেনাস
নেপচুন
প্লুটো
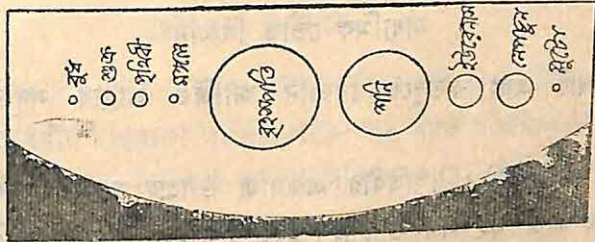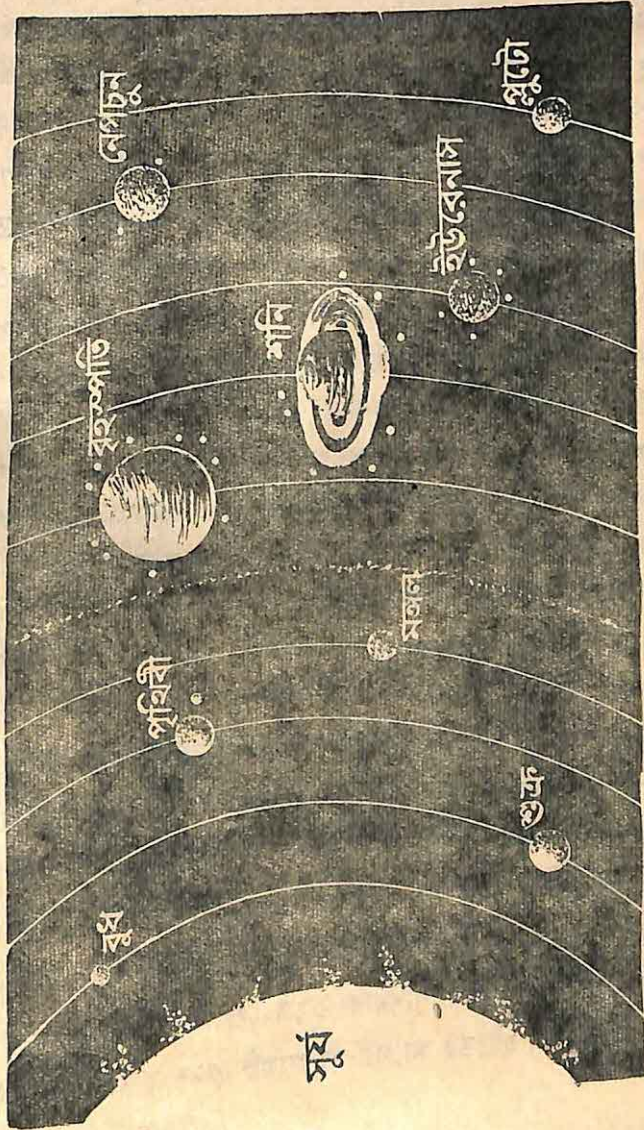
ধারায় কোথায় এবং কতদূরে বিজ্ঞান আজিও তাহার সদ্‌উত্তর দিতে পারে না।

চন্দ্র (Moon) ঃ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চন্দ্র। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব মাত্র দুই লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইল। অর্থাৎ বলিতে পারো মহাশূন্যে চন্দ্র আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। ঘণ্টায় ১২০০ মাইল গতিবেগের বিমানের পক্ষে মাত্র ৮$\frac{১}{৩}$ দিনের পথ।

চন্দ্র নিজের নির্দিষ্ট কক্ষপথে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। পৃথিবীর চারিদিকে একবার ঘুরিতে চন্দ্রের সময় লাগে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩$\frac{১}{২}$ মিঃ। এইরূপে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় চন্দ্রের একটি দিকই সর্বদা পৃথিবীর দিকে থাকে। আমরা এই দিকটাই কেবল দেখিতে পাই। চন্দ্রের উল্টো দিক আমরা দেখিতে পাই না। পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র আয়তনে অনেক ছোট। চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলো নাই বলিয়াই জ্যোতির্বিদগণ চন্দ্রকে উপগ্রহ বলেন। সূর্যের আলো চন্দ্রের উপর আসিয়া পড়ে ও চন্দ্রকে আলোকিত করে। চন্দ্র হইতে সেই আলো প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসিয়া পড়ে বলিয়া আমরা চন্দ্রকে উজ্জ্বল দেখি। অতএব জ্যোৎস্না রাত্রে চন্দ্রের যে আলো দেখিতে পাই উহা সূর্যেরই প্রতিফলিত আলো। চন্দ্রে রাত্রে যেমন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, দিনে তেমনি অত্যধিক গরম ও আলোর প্রখরতার জন্য দিনের বেলায় রঙীন চশমা পরিতে হয়। এই রকম একটি বায়ুমণ্ডলহীন অনিয়ন্ত্রিত তাপমাত্রা সমন্বিত জায়গায় বাস করাটা নিশ্চয়ই সুখপ্রদ নয়।

চন্দ্রের কলা ঃ পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে আর পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে চন্দ্র। এইভাবে ঘোরার সময় চন্দ্রের যে অংশ সূর্যের দিকে থাকে সেই অংশই শুধুমাত্র আলোকিত হয়—অপরদিক আলোকহীন বলিয়া অন্ধকার। পৃথিবীর যে দিকে সূর্য উহার বিপরীত দিকে যখন চন্দ্র থাকে তখন চন্দ্রের সম্পূর্ণ আলোকিত অংশটুকু আমরা দেখিতে পাই। এই সময়কেই পূর্ণিমা বলে। পূর্ণিমার রাত্রে চন্দ্রকে সম্পূর্ণ গোলাকার দেখায়। পূর্ণিমার পরের দিন হইতেই আলোকিত অংশটি ক্রমশ কমিতে থাকে ও কমিতে

কমিতে কাস্তের মত সরু হইয়া যায়। পনের দিনে চন্দ্র স্ব-কক্ষপথে চলিতে চলিতে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসিয়া পড়ে। এই সময়কে অমাবস্যা বলে। অমাবস্যার রাত্রে আকাশের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই সেই অংশে চন্দ্র থাকে না, থাকে অন্য অংশে, সেইজন্য অমাবস্যার রাত্রিতে চন্দ্রকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অমাবস্যার পরে প্রথমে চন্দ্রের আলোকিত অংশটিকে পশ্চিম আকাশে দিগন্তের কাছে সরু এককালি কাস্তের মতন দেখায়। পরের পনের দিন ধরিয়া চন্দ্র তাহার পথে চলিতে চলিতে আবার পৃথিবীর যে দিকে সূর্য তাহার বিপরীত দিকে পৌঁছায়। এই সময়ে চন্দ্রের আলোকিত অংশ যাহা আমরা দেখিতে পাই উহা ক্রমশ বাড়িতে থাকে এবং পূর্ণিমা রাত্রে চন্দ্র আবার সম্পূর্ণ গোলাকার দেখায়। মোটকথা পৃথিবী হইতে চন্দ্রের আলোকিত অংশ যেটুকু দেখা যায়, উহা শুক্লপক্ষে অর্থাৎ অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ক্রমশ বাড়ে এবং কৃষ্ণপক্ষে অর্থাৎ পূর্ণিমা হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত ক্রমশ কমে। পৃথিবী হইতে চন্দ্রের আলোকিত অংশের যেটুকু আমরা দেখিতে পাই উহাকেই চন্দ্রের কলা বলে। এক পূর্ণিমা হইতে পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত সময় লাগে ২৯ দিন।

পৃথিবীতে চন্দ্রের প্রভাবঃ চন্দ্রের নিজস্ব আলো না থাকিলেও সূর্যের আলো চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া পৃথিবীতে আসে। চন্দ্রের আলো থাকিলে আমাদের চলাফেরা ও কাজকর্মের নিশ্চয়ই সুবিধা হয়, বিশেষ করিয়া যাহারা গ্রামে বসে করে।

সূর্য এবং চন্দ্র উভয়েই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে ; কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটে বলিয়া চন্দ্রের আকর্ষণ প্রবল। চন্দ্রের এই আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার ও ভাঁটা হয়। এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ৫.৬ অনুচ্ছেদে করা হইয়াছে।

৬.৪. রাত্রির আকাশ (Night Sky)ঃ দিনের শেষে সূর্য অস্ত যাওয়ার পর চারিদিক অন্ধকার হইয়া যায়। রাত্রি আরম্ভ হয়। এইসময় দেখা যায় আকাশের গায়ে অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকবিন্দু মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে। চন্দ্রের মতন ইহাদের আলো স্থির নয়। ইহাদের নাম নক্ষত্র বা চলিত ভাষায় তারা।

প্রায় ২০০০ হাজার বৎসর পূর্বে আলেকজ্যাণ্ড্রিয়ার দার্শনিক টলেমি আকাশের তারা গুণিতে আরম্ভ করেন, হয়তো কোন কাজ ছিল না। শেষ অবধি তিনি দেখিলেন, সর্বসমেত ১,০২২টি তারা আছে। আজ বিজ্ঞান বলিতেছে—খালি চোখেই প্রায় ৩০০০ তারা দেখা যায়, দূরপাল্লার দূরবীণে কয়েক কোটি। ইহা ছাড়া অধুনা প্রচলিত রেডিও জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে আবার চোখে দেখিতে না-পাওয়া তারার কথাও জানা যাইতেছে।

তারাগুলির অনেকেই আকারে সূর্য অপেক্ষা বহুগুণ বড়। পৃথিবীর নিকট হইতে ইহারা অনেক অনেক দূরে রহিয়াছে বলিয়া ইহাদের এত ছোট দেখায়। প্রত্যেকটি তারার সূর্যের মত আলো আছে। খালি চোখেই বোঝা যায় যে—সব তারার রং এক নয়। এই পার্থক্যের কারণ, তারাগুলির তাপমাত্রার তারতম্য।

অন্ধকার আকাশে নক্ষত্র ছাড়া আরও কতকগুলি উজ্জ্বল আলোকবিন্দু দেখা যায়। এইগুলির আলো স্থির, মিটমিট করে না। ইহারা সূর্যের গ্রহ। গ্রহগুলি স্ব-স্ব কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

সন্ধ্যাতারা (Venus) : সন্ধ্যার পরেই পশ্চিম আকাশে দিগন্তের খুব নিকটেই একটি অতি উজ্জ্বল বড় তারা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার নাম সন্ধ্যাতারা। এইটি কিন্তু নক্ষত্র নয়, এইটি একটি গ্রহ। সন্ধ্যাতারা আকাশের এক জায়গায় স্থির থাকে না, কারণ অন্যান্য গ্রহের মত এইটিও সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে। যখন ইহাকে সূর্যোদয়ের পূর্বে দেখিতে পাই তখন ইহাকে আমরা শুকতারা বলি। লক্ষ্য করিলে দেখিবে, সন্ধ্যাতারার আলোক স্থির ও অতি উজ্জ্বল। এই সন্ধ্যাতারা বা শুকতারাই শুক্রগ্রহ।

এই গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যতটা সাদৃশ্য, ততটা অন্য গ্রহের সহিত নাই। সেইজন্য এইরূপ ধারণা হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, শুক্রগ্রহে জীবের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। এই ধারণা আরো দৃঢ় হয় যখন আমরা দেখি যে, পৃথিবী অপেক্ষা শুক্র সূর্যের অনেক কাছে বলিয়া ইহা পৃথিবীর তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ আলো ও তাপ পাইয়া থাকে। শুক্রের আবহমণ্ডল পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে, শুক্রের অক্সিজেনের পরিমাণ পৃথিবীর আবহমণ্ডলের অক্সিজেনের

পরিমাণের মাত্র ০·০০১ ভাগ। ইহা ছাড়া জলীয় বাষ্প, প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইডের অস্তিত্বও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে। তাই অনেকেই মনে করেন যে, শুক্র গ্রহের সবটাই হয়ত মহাসাগরে আবৃত। গাছপালা না থাকায় আলোক-সংশ্লেষণের দ্বারা সেখানে অক্সিজেনও উৎপন্ন হয় না।

অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রগুলিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, স্থানে স্থানে কতকগুলি নক্ষত্র একত্রে দল বাঁধিয়া রহিয়াছে। এইরূপ নক্ষত্রের দলকে নক্ষত্রমণ্ডল বলে। জ্যোতির্বিদ্‌গণ এক একটি দলের নানারূপ কাল্পনিক মূর্তির আকার কল্পনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করিয়াছেন। যেমন—

ধ্রুবতারা (Pole Star): এই নক্ষত্রটি পৃথিবীর উত্তর মেরুর ঠিক উপরে সর্বদাই আকাশের একই স্থানে থাকে। ধ্রুবতারা লক্ষ্য করিয়া অন্ধকার রাত্রে দিক নির্ণয় করা যায়।

সপ্তর্ষিমণ্ডল (Ursa major): ফাল্গুন-চৈত্র মাস হইতে ভাদ্র-আশ্বিন মাস পর্যন্ত উত্তর দিকের আকাশে নক্ষত্রের একটি মণ্ডল দেখা যায়। কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করিলে ইহাদের অনেকটা জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতন দেখায়। সাতজন ঋষির নামে নক্ষত্র সাতটি পরিচিত।

ক্যাসিওপিয়া (Casiopya): ধ্রুবতারার যে দিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা যায় উহার বিপরীত দিকে ক্যাসিওপিয়া নামে আর একটি নক্ষত্রমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়। এই নক্ষত্রমণ্ডলে পাঁচটি নক্ষত্র আছে। সন্ধ্যা হইতে সারা রাত্রি ধরিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ক্যাসিওপিয়া ধ্রুবতারাকে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিম দিকে ঘড়ির কাঁটার পথের উল্টোদিকে ঘুরিতেছে বলিয়া মনে হয়। পৃথিবী প্রতিদিন পশ্চিম হইতে পূর্ব দিকে পাক খায় বলিয়া এইরূপ মনে হয়।

কালপুরুষ (Orion): মাঘ-ফাল্গুন মাসে সন্ধ্যার পর আকাশের দক্ষিণ অংশে একটি নক্ষত্রমণ্ডল দেখা যায়। ইহার নাম কালপুরুষ। কাল্পনিক রেখা দিয়া যোগ করিলে ইহাকে মানুষের মতন দেখায়। মাঘ মাসে ইহাকে দেখা যায় দক্ষিণ-পূর্ব আকাশে। আবার বৈশাখ মাসে ইহাকে দেখা যায় দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে।

ছায়াপথ (Milky way) ঃ অন্ধকার রাত্রে আকাশের গায়ে দক্ষিণ হইতে উত্তর পর্যন্ত বিস্তৃত একটি পথের মতন আলোর পথ দেখা যায়। ইহাকে ছায়াপথ বলে। অসংখ্য নক্ষত্র মিলিয়া এই ছায়াপথের সৃষ্টি। এই নক্ষত্রগুলি পৃথিবী হইতে বহু দূরে বলিয়া ইহাদের পৃথক পৃথক ভাবে দেখা যায় না। ছায়াপথের আলো কম বলিয়া ঘন অন্ধকার রাত্রি ছাড়া ইহাদের দেখা যায় না।

উল্কা (Meteor) ঃ অন্ধকার রাত্রির আকাশে কখনও কখনও ক্ষণস্থায়ী দুই একটি উজ্জ্বল আলোর রেখা দেখা যায়। অনেকে ইহাকে নক্ষত্রপাত বা তারা খসা বলে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে, এই সব নক্ষত্রপাতের ব্যাপার মোটেই নয়, আসলে এগুলি উল্কাপাত।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীম শূন্যতার মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণকারী কতকগুলি বস্তুপিণ্ডই হইল উল্কা। সঞ্চরণকালে এইগুলি যখন মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে প্রবলবেগে পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া বায়ুমণ্ডলের মধ্যে আসিয়া পড়ে তখন বাতাসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে জ্বলিয়া ওঠে। সাধারণত জ্বলিবার সময় ইহাদের গতিবেগ থাকে প্রতি সেকেণ্ডে ১০ হইতে ৭০ কিলোমিটার। জ্বলিয়া উঠিবার কিছুক্ষণ পরেই এক একটি উল্কা কয়েকটি অংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিবিয়া যায়। কাজেই খুব বড় রকমের উল্কা ছাড়া ছোট উল্কাগুলি পৃথিবীর বুকে পৌঁছাইতে পারে না।

আমাদের সৌরমণ্ডলের আকাশ, অর্থাৎ গ্রহান্তরবর্তী মহাশূন্য অসংখ্য উল্কা-সমাকীর্ণ। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্কারাশির মধ্য দিয়াই পৃথিবীকে সূর্য পরিক্রমা করিতে হয়। মহাকাশ অভিযানেও এই উল্কার মধ্য দিয়াই যাইতে হয়।

আকাশের কোনও এক কোণ হইতে যখন উল্কার ঝাঁক নামিয়া আসে, তখন উহাকে উল্কাবৃষ্টি বলে। এই রকমের উল্কাবৃষ্টির দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অনেক সময় বাতাসের সহিত সংঘর্ষের ফলে উল্কার ক্ষয়িত অংশ উর্ধ্বাকাশে ধূম্রজালের মতন প্রতীয়মান হয়।

৬.৫. নিকোলাস কোপার্নিকাস

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক নিকোলাস কোপার্নিকাস ১৪৭৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারী পোল্যাণ্ডের তোরান শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

স্কুলের পড়া শেষ করিয়া তিনি বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলেন। বোলোনায় তাঁহার পাঠ্য বিষয় ছিল ধর্মবিষয়ক আইন বা ক্যানন-ল। তিনি ধর্মীয় আইনে ডক্টরেট ডিগ্রী লইয়া ধর্মযাজকের পদে যোগ দিয়াছিলেন।

১৫০৬ খ্রীস্টাব্দে ধর্মীয় প্রশাসক হিসাবে তিনি যখন এরমল্যাণ্ডে, তখন পোল্যাণ্ডের রাজা ও জার্মান টিউটনিক 'ন' ইটজের মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়াছিল। যুদ্ধের পর কোপার্নিকাস নূতন করিয়া সুরু করিয়াছিলেন তাঁহার মহাকাশ সম্বন্ধে গবেষণা। কয়েক বৎসরের পরে তাঁহার গবেষণালব্ধ ফলাফল-সম্বলিত 'লিটল কমেন্টারী' নামে কুড়ি পাতার একটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হইয়াছিল। 'লিটল কমেন্টারী'তে সূত্রাকারে বলা হইয়াছিল ঃ—(এক) পৃথিবী নয়, সূর্যই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে স্থির ও অবিচল। (দুই) পৃথিবী তাহার অক্ষে দাঁড়াইয়া দিনে একবার আবর্তন করে, যাহার ফলে দিন ও রাত্রি হয়। (তিন) পৃথিবীসহ সমস্ত গ্রহই নিজ নিজ বৃত্তাকার কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে। আর ইহার ফলেই পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হইয়া থাকে।

বাইবেল বিরোধী এই তত্ত্ব প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে প্রতিবাদের ঝড় উঠিয়াছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতা মার্টিন লুথারও তীব্রভাবে ইহার সমালোচনা করিয়াছিলেন।

কোপার্নিকাসের সহকর্মীরাও তাঁহাকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়াছিলেন। কিন্তু কোপার্নিকাস তাঁহার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাইতে থাকিলেন পূর্ণ উদ্যমে। নানা নতুন তথ্য পর্যবেক্ষণ ও গণনার ফল সমন্বিত 'লিটল কমেণ্টারী' ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে গ্রন্থাকারে সম্পূর্ণ হইলে কোপার্নিকাস সেইটির নাম দিয়াছিলেন 'ডি রেভেলুশানিয়াস অরবিয়াম' বা কক্ষপথের ঘূর্ণন। এই বইটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি অমূল্য গ্রন্থ। ১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মে গ্রন্থটি প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার আগেই কোপার্নিকাসের মৃত্যু হয়।

কোপার্নিকাসের সময়ে দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রচলিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে অথবা খালি চোখেই চলিত তাঁহার পর্যবেক্ষণের কাজ। গণনার দিক হইতে তিনি প্রতিভাবান হইলেও তাঁহার পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ছিল ত্রুটিপূর্ণ এবং পুরানো ধরনের। সূর্যকে তিনি স্থির ভাবিয়াছিলেন। মহাকাশ যে অসীম, সে সম্পর্কেও তাঁহার কোন ধারণা ছিল না।

জোয়ান কেপলার (Joan Kepler)

জার্মানীর অন্তর্গত Wütemburg-এর নিকট Wiel নামক শহরে ১৫৭১ খ্রীস্টাব্দের এক অতি দরিদ্র পরিবারে কেপলার জন্মগ্রহণ করেন। দারিদ্র্যের তাড়নায় অতি অল্প বয়সে তিনি একটি হোটেলে থালা, বাটি ধৌত করিবার কাজ করিতেন। নানান দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি পড়াশুনা করিতেন। নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তিনি Tübingen বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক হন। তিনি আলোক

বিজ্ঞান ও সৌর বিজ্ঞানের উপর গবেষণা করিয়া আলোর সরলরেখায় গমন, আলোর প্রতিফলন ও প্রতিসরণের উপর বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেন। ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে বিখ্যাত ড্যানিস জ্যোতির্বিদ Tychobrahe

সহকারীহিসাবে কাজ করেন। Tychobrahe-এর মৃত্যুর পর তিনি ঐ গবেষণাগারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ও পরিচালক নিযুক্ত হন। ঐ গবেষণাগারে থাকাকালীন অবস্থায় তিনি মঙ্গলগ্রহের উপর বহু গবেষণা করেন। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে তিনি Linz-এর একটি গবেষণাগারে যোগদান করেন। এই সময় "Harmonices Mundi" নামক বিখ্যাত গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গ্যালিলিও গ্যালিলি (Galileo Galilei)

অঙ্ক, জ্যোতির্বিজ্ঞান, বিশুদ্ধ পদার্থবিজ্ঞানে বহু মূল্যবান তথ্যের আবিষ্কারক গ্যালিলিও ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি পিসা (Pisa) বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নের সময় ইউক্লিড (Euclid)-এর একটি বক্তৃতা শুনিতে যান। সেই বক্তৃতা শুনিয়া তাহার অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি গভীর আগ্রহের সৃষ্টি হয়। তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ে নূতন করিয়া অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে থাকেন। কিছুদিন অঙ্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পর তিনি কঠিন পদার্থের ভারকেন্দ্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্যালিলিওর প্রতিভায় বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত করিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার বিখ্যাত পতনশীল বস্তুর নিয়ম আবিষ্কার করেন।

ইহার পূর্বে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) বলেন যে, ভারী বস্তু যত তাড়াতাড়ি পড়িবে, উহা অপেক্ষা হালকা বস্তু ধীরে ধীরে পড়িবে।

গ্যালিলিও অ্যারিস্টটলের মতবাদ ভুল প্রমাণ করিবার জন্য পিসার একটি উচ্চ মিনার হইতে একটি লোহার বল ও একই আয়তনের কাঠের বল নিক্ষেপ করিয়া প্রমাণ করেন যে, বস্তু ভারী হউক বা হাল্কা হউক না কেন, উহাদের পড়িবার সময় একই থাকে। গ্যালিলিও-র এই পরীক্ষা "পিসা টাওয়ার পরীক্ষা" নামে বিখ্যাত হইয়া আছে।

এইভাবে গ্যালিলিও-ই সর্বপ্রথম এইরূপ পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করেন ও উহার সাহায্যে গ্রহ-তারকাদির সম্বন্ধে বহু তথ্য নির্ণয় করেন। তিনি বৃহস্পতির চারিটি উপগ্রহ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মান পণ্ডিত কোপার্নিকাস সিদ্ধান্ত করিলেন সূর্যই সৌরজগতের কেন্দ্র; গ্রহ উপগ্রহাদি তাহাকেই প্রদক্ষিণ করিতেছে। গ্যালিলিও দূরবীক্ষণের সাহায্যে কোপার্নিকাসের প্রবর্তিত মতের সত্যতা প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণ করেন ও কোপার্নিকাসের মতবাদকে সমর্থন করেন। প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে এই নূতন মত প্রচার করার জন্য গ্যালিলিওকে জনসাধারণ ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের অনেক অত্যাচার ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল ও শেষ পর্যন্ত তিনি পিসা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। পিসা ত্যাগ করিয়া তিনি ফ্লোরেন্সে (Florence) বসবাস করিতেন। ১৬৪২ খ্রীস্টাব্দে ফ্লোরেন্সের নিকট একটি গ্রামের বাড়ীতে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৬.৬. **আলো ও ইহার উৎস (Light and its sources):** আলো থাকিলেই আমরা সকল বস্তু দেখিতে পাই। অন্ধকারে আমরা কিছুই দেখিতে পাই না। আবার আলোর মধ্যে চোখ বন্ধ রাখিলেও কিছুই দেখা যায় না। একজন অন্ধ কিছুই দেখিতে পায় না। আলো সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণাই নাই। সুতরাং বলিতে পারি যে, আলো এমন এক অনুভূতি যাহার সাহায্যে আমরা দেখিতে পাই। যে কোন বস্তু হইতে আলো আসিয়া যখনই চোখে পড়ে, তখনই আমরা দেখিতে পাই।

আলো একপ্রকার শক্তি। একটি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিলে তারটি উত্তপ্ত হইয়া আলো দান করে। এখানে তড়িৎশক্তি আলোয় রূপান্তরিত হয়। মোমবাতি ও কেরোসিন ল্যাম্প জ্বালাইলে আলো পাওয়া যায়। এই সব ক্ষেত্রে তাপশক্তি ও রাসায়নিক শক্তি আলোয় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং বলিতে পারি যে, আলো একপ্রকার শক্তি।

আলো নিজে অদৃশ্য থাকিয়া, অপর বস্তুকে দেখিতে সাহায্য করে।

একটি অন্ধকার ঘরের একটি জানালার ছিদ্র দিয়া যখন সূর্যের আলো ঘরে আসিয়া পড়ে, সে সময় আলোর গতিপথ আমরা দেখিতে পাই। আসলে আমরা আলোক দেখিতে পাই না। অন্ধকার ঘরে বাতাসে ভাসমান অসংখ্য ধূলিকণার উপর আলো পড়িয়া উজ্জল হইয়া দৃষ্টিগোচর হয়। সুতরাং আলোক শক্তিও অদৃশ্য।

যে বস্তু আলো দান করিতে পারে তাহাকেই আলোর উৎস বা প্রভব বলে। উৎস দুই প্রকার যেমন (i) স্বপ্রভ—যে বস্তুর নিজস্ব আলো আছে এবং নিজ হইতেই আলো দান করে তাহাদের স্বপ্রভ উৎস বলে। যেমন, সূর্য, নক্ষত্র, ধূমকেতু, জ্বলন্ত মোমবাতি, জ্বলন্ত ইলেকট্রিক বাতি ইত্যাদি। (ii) অপ্রভ—যে সকল বস্তুর নিজস্ব কোন আলো নাই। যাহার স্বপ্রভ উৎস হইতে আলো গ্রহণ করিয়া, পরে সেই আলো দান করে, সেই সকল উৎসকে অপ্রভ উৎস বলে। চাঁদ, চেয়ার, বাড়ী, গাছপালা, মানুষ, জীবজন্তু প্রভৃতি সকল বস্তুই অপ্রভ উৎস।

৬.৭. **আলোর মাধ্যম (Medium of light) :—** আলো যে মাধ্যমের ভিতর দিয়া চলাচল করিতে পারে তাহাকে আলোর মাধ্যম বলে। যে মাধ্যমের সকল স্থানের ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম সমান, সেই মাধ্যমকে সমসত্ত্ব মাধ্যম বলে। সে মাধ্যমের সকল স্থানের ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম সমান নহে তাহাকে অসমসত্ত্ব মাধ্যম বলে।

যে সমসত্ত্ব মাধ্যমের ভিতর দিয়া আলো অতি সহজে চলাচল করিতে পারে তাহাকে স্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন কাচ, বায়ু, জল ইত্যাদি। এই মাধ্যমের ভিতর দিয়া যে কোন বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়। যে মাধ্যমের ভিতর আলো একেবারেই চলাচল করিতে পারে না, তাহাকে অস্বচ্ছ মাধ্যম বলে। যেমন ইট, কাঠ, পাথর, ধাতু প্রভৃতি। কতকগুলি মাধ্যম আছে, যাহার মধ্য দিয়া আলো ভালভাবে চলাচল করিতে পারে না। এই সকল মাধ্যমের ভিতর দিয়া বস্তুকে পরিষ্কার দেখা যায় না। যেমন ঘষা কাচ, তৈলাক্ত কাগজ, কাপড় ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমের স্বচ্ছতা গভীরতার উপর নির্ভর করে। যেমন, অগভীর জল স্বচ্ছ, কিন্তু গভীর জল অস্বচ্ছ।

৬.৮. আলোক রশ্মি (Rays of light) ঃ স্বপ্রভ বা অপ্রভ বস্তু কতকগুলি বিন্দু উৎসের সমষ্টি। প্রতিটি উৎস বিন্দু হইতে আলো চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। যে কোন সমসত্ত্ব মাধ্যমের মধ্য দিয়া আলো সরলরেখায় চলাচল করে। আলোর একটি পথ একটি সরল রেখা দ্বারা সূচিত হয়। আলোর এই সরল রৈখিক পথকে আলোক রশ্মি বলে। একটি রশ্মিকে সরলরেখা দ্বারা ও তীর চিহ্ন দিয়া ইহার দিক নির্ণয় করা হয়। অনেকগুলি আলোকরশ্মির সমষ্টিকে রশ্মিগুচ্ছ বলে। উৎস যতই ক্ষুদ্র হউক না কেন, তাহা হইতে সকল সময়ে রশ্মিগুচ্ছ বিকীর্ণ হইবে। সুতরাং বাস্তবে একটি রশ্মির কোন অস্তিত্ব নাই। কিন্তু রশ্মিগুচ্ছের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। ইহাদের তিন ভাগে ভাগ করা হয়। কোন বিন্দু উৎস হইতে রশ্মিগুলি নির্গত হইয়া চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাকে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ বলে। যখন চতুর্দিকে ছড়ান রশ্মিগুচ্ছ একটি বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হয়, তখন ইহা অভিসারী রশ্মিগুচ্ছ। কিন্তু একটি রশ্মিগুচ্ছের সকল রশ্মিগুলি পরস্পর সমান্তরাল হইলে সেই রশ্মিগুচ্ছকে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ বলে।
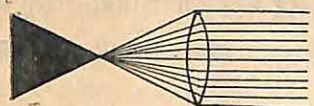
৬.৯. আলোর ঋজুগতি (Light travels in a straight line) ঃ একটি সমসত্ত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় চলাচল করে। বিভিন্ন ঘটনা হইতে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করি। অন্ধকার ঘরের জানালার ছিদ্র দিয়া যখন সূর্যের
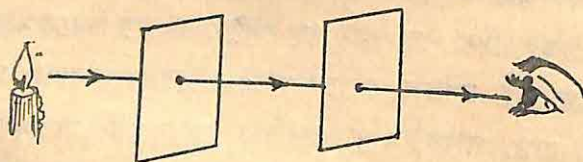
আলো প্রবেশ করে ; তখন বাতাসের ধূলিকণাগুলি উজ্জ্বল হইয়া আলোর গতিপথকে দেখিতে সাহায্য করে। ঐ গতিপথ সরলরেখা। অন্ধকার রাস্তায়

হেড্‌লাইট জ্বালিয়া যখন মোটর যায়, তখন হেড্‌ লাইটের আলোর গতিপথ সরলরেখায় দেখা যায়।

একটি সহজ পরীক্ষা দ্বারা আলোর ঋজুগতির সত্যতা নির্ধারণ করা যায়। দুইটি শক্ত পিচ বোর্ড লওয়া হইল। প্রত্যেকটি বোর্ডের মধ্যস্থলে একটি করিয়া ছিদ্র আছে। একটি সূতা প্রত্যেকটি ছিদ্র দিয়া গলাইয়া দুই দিকে টান করিয়া ধরা হইল, ইহাতে ছিদ্র দুইটি এক সরলরেখায় থাকিবে। এখন সুতাটি সরাইয়া ইহার এক প্রান্তে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখিয়া অপর প্রান্তে চোখ রাখিলে ছিদ্র দিয়া মোমবাতির আলো দেখা যাইবে। এখন যে কোন একটি বোর্ডকে এদিক ওদিক সরাইলে আর মোমবাতির আলো দেখা যাইবে না। ইহার কারণ দুইটি ছিদ্র আর এক সরলরেখায় নাই, সেইজন্য আলো বাধাপ্রাপ্ত হইয়া চোখে পৌঁছিবে না। ইহা হইতে প্রমণিত হয় যে, আলো সরলরেখায় যায়। যদি আলো বক্রপথে চলাচল করিতে পারিত, তাহা হইলে একটি বোর্ডকে সরাইলেও আলো ঘুরিয়া দুইটি বোর্ডের ছিদ্র দিয়া চোখে আসিয়া পড়িত ও আলো দেখা যাইত।

৬.১০. সূচী ছিদ্র ক্যামেরা (Pinhole Camera): এই ক্যামেরার সাহায্যেও প্রমাণ করা যায় যে, আলো সরলরেখায় চলাচল করে। একটি আয়তাকার কাঠের বাক্সের সম্মুখের দেওয়ালে একটি সূচী ছিদ্র O আছে। ইহার বিপরীত দেওয়াল একটি ঘষা কাচের তৈয়ারী। বাক্সের ভিতর কালো রং করা থাকে। ছিদ্রটি সোজা কোন দূরবর্তী আলোকিত বস্তুর দিকে ধরিলে বাক্সের ঘষা কাচে বস্তুটির উল্টা প্রতিকৃতি সৃষ্টি হইবে।
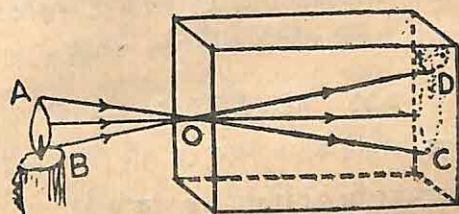
মনে করা যাক, সূচী ছিদ্রের সম্মুখে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি AB রাখা আছে। মোমবাতির শিখার A বিন্দু হইতে একটি রশ্মি AO রেখায় সোজা-সুজি ক্যামেরার মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং পর্দার উপর C বিন্দুতে পড়িয়া A

বিন্দুর প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিবে। অনুরূপে শিখার নিম্নপ্রান্ত B বিন্দু হইতে একটি মাত্র রশ্মি BO পথে যাইয়া পর্দায় D প্রতিকৃতি সৃষ্টি করিবে। এইরূপে সমগ্র মোমবাতি AB-এর উল্টা প্রতিকৃতি CD পর্দার উপর সৃষ্টি হইবে। ঘষা কাচের পর্দার পরিবর্তে একটি ফটোগ্রাফি প্লেট রাখিলে, একটি উল্টা ছবি উঠিবে।

চিত্র হইতে প্রমাণ করা যায় যে,

$$\frac{\text{বস্তুর দৈর্ঘ্য}}{\text{প্রতিকৃতির দৈর্ঘ্য}} = \frac{\text{ছিদ্র হইতে বস্তুর দূরত্ব}}{\text{ছিদ্র হইতে প্রতিকৃতির দূরত্ব}}$$

যদি আলো সরলরেখায় না যাইত, তাহা হইলে O ছিদ্র দিয়া A, B বিন্দু হইতে একটি মাত্র রশ্মি প্রবেশ না করিয়া অনেক রশ্মি বাঁকিয়া ঢুকিয়া পড়িত এবং পর্দাকে আলোকিত করিত এবং কোন উল্টা প্রতিকৃতি সৃষ্টি হইত না। পুনরায় আলো সরলরেখায় যায় বলিয়া বস্তুর দৈর্ঘ্য ও প্রতিকৃতির দৈর্ঘ্যের সম্বন্ধ ঠিক থাকে। অতএব বলা যায় যে, আলো সরলরেখায় গমন করে।

সূচী ছিদ্র না করিয়া যদি একটি বড় ছিদ্র করা হয়, তাহা হইলে কোন উল্টা প্রতিকৃতি সৃষ্টি হইবে না। কারণ বড় ছিদ্র অনেকগুলি সূচী ছিদ্রের সমষ্টি এবং প্রত্যেকটি ছিদ্র এক একটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিবে এবং একটির উপর আর একটি পড়িয়া প্রতিকৃতি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে।

৬.১১ **গাছের ছায়া** : পত্রবহুল গাছের ছায়া লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে গোলাকৃতি ও ডিম্বাকৃতি আলোকিত অংশ দেখা যায়। অনেকগুলি পাতা পর পর থাকায় তাহার মধ্যে একটি সরু ছিদ্রপথ থাকিয়া যায় এবং সূচী ছিদ্রের নিয়ম অনুযায়ী সূর্যের প্রতিকৃতি সৃষ্টি হয়। সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়িলে গোলাকৃতি এবং সূর্যরশ্মি আনতভাবে পড়িলে ডিম্বাকৃতি আকারের আলোকিত অংশ সৃষ্টি হইবে।

৬.১২ **ছায়া (Shadow)** : আলোর উৎসের সম্মুখে একটি অস্বচ্ছ বস্তু রাখিলে তাহার পিছনে ছায়ার সৃষ্টি হয়। আলো সরলরেখায় চলে, তাহার প্রমাণ ছায়ার সৃষ্টি। যদি আলো বাঁকা পথে যাইত তাহা হইলে ছায়া সৃষ্টি

হইত না। উৎস ও অস্বচ্ছ বস্তু উভয়ের আকৃতির উপর ছায়ার আকৃতি ও প্রকৃতি নির্ভর করে। রাস্তার বাতির সম্মুখে দাঁড়াইলে মানুষের একটি বিস্তৃত ছায়া রাস্তার উপর সৃষ্টি হয়। (চিত্র ১ দেখ)
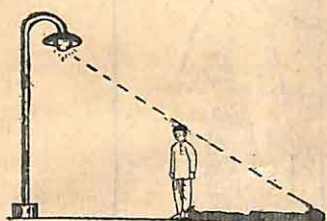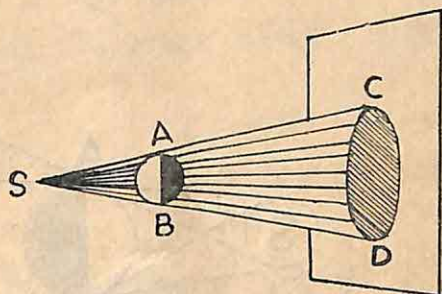
চিত্র ১ চিত্র ২

(১) বিন্দু প্রভব ও যে কোন অস্বচ্ছ বস্তু: AB একটি অস্বচ্ছ বস্তু ইহাদের সম্মুখে একটি বিন্দু প্রভব S অবস্থিত। S বিন্দু হইতে রশ্মি বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়িবে এবং SAB শঙ্কু আকারের অপসারী রশ্মি-গুচ্ছ অস্বচ্ছ বস্তু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইবে। দুই প্রান্ত রশ্মি SA ও SB বস্তুর ধার দিয়া যাইয়া পর্দার উপর C ও D বিন্দুতে পড়িবে। অতএব CD মধ্যবর্তী স্থানে একটি ছায়ার সৃষ্টি হইবে। যদি AB বস্তু গোলাকৃতি হয়, তাহা হইলে CD ছায়া বৃত্তাকার হইবে। বস্তুর আকৃতি যত বড় হইবে, ছায়ার আকৃতিও তত বড় হইবে। প্রভব যত নিকটে আনা যায়, ছায়া ততই বড় হইবে এবং পর্দা যত দূরে সরান যায় ছায়াও ততই বড় হইবে। (চিত্র ২ দেখ)

(২) অস্বচ্ছ বস্তু ও বিস্তৃত আলোক প্রভব: বিস্তৃত আলোক প্রভবের সম্মুখে একটি অস্বচ্ছ বস্তু রাখিলে, বস্তুর পিছনে যে ছায়ার সৃষ্টি হয় তাহাতে দুইটি অংশ থাকে। মধ্যস্থলে একটি গাঢ় অন্ধকার স্থান, সেখানে উৎস হইতে কোনরূপ আলো আসিয়া পড়ে না। এই গাঢ় অন্ধকার স্থানকে প্রচ্ছায়া (Umbra) বলে। প্রচ্ছায়াকে বেষ্টন করিয়া একটি স্বল্পান্ধকার স্থান থাকে। এখানে উৎসের কোন না কোন স্থান হইতে আলো পড়ে।

এই স্বল্পান্ধকার স্থানকে উপচ্ছায়া (Penumbra) বলে। উপচ্ছায়া হইতে উৎসের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কোন না কোন অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।
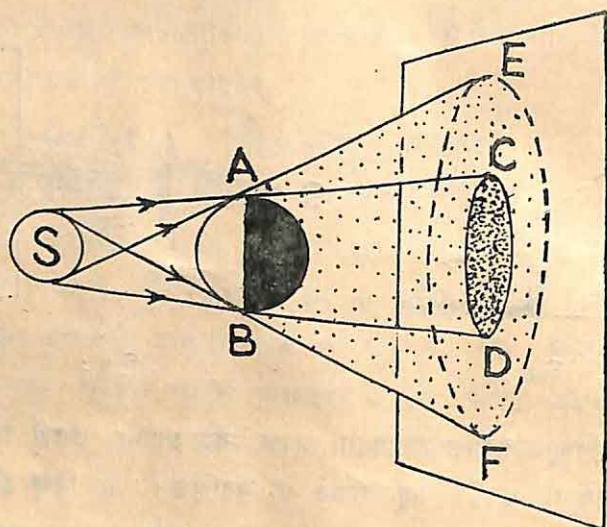
(ক) **প্রভব, বস্তু অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর :** S একটি গোলাকার প্রভব। ইহার সম্মুখে AB একটি গোলাকার অস্বচ্ছ বস্তু। বস্তু, প্রভব হইতে বৃহত্তর। প্রভবের প্রত্যেকটি বিন্দুকে একটি করিয়া বিন্দু প্রভব বলিয়া ধরা যায়। প্রভবের উপরের বিন্দু হইতে শঙ্কু আকৃতি অপসারী রশ্মিগুচ্ছ অস্বচ্ছ বস্তু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পর্দায় CF অংশে ছায়ার সৃষ্টি করিবে। অনুরূপে নীচের বিন্দু হইতে অপসারী রশ্মিগুচ্ছ বাধাপ্রাপ্ত হইয়া পর্দায় DE অংশে ছায়ার সৃষ্টি করিবে। অতএব E হইতে F পর্যন্ত বিস্তৃত ছায়ার সৃষ্টি হইবে। ইহার মধ্যে CD অংশ উৎসের কোন অংশ হইতেই আলো পায় না। অতএব ইহা গাঢ় অন্ধকার, ইহা প্রচ্ছায়া। EC এবং DF অংশ উৎসের কোন অংশ হইতে আলো পায়। অতএব EC ও DF অংশ স্বল্পান্ধকার, ইহাকে উপচ্ছায়া বলে। যেহেতু উৎস ও বস্তু উভয়েই গোলাকার সেইজন্য প্রচ্ছায়া একটি বৃত্তাকার হইবে, ইহার চতুর্দিক ঘিরিয়া বৃত্তাকার উপচ্ছায়া সৃষ্টি হইবে। পর্দা দূরে সরাইলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার আকার বৃদ্ধি পাইবে।

(খ) **প্রভব, বস্তু অপেক্ষা বৃহত্তর ঃ** S একটি গোলাকার প্রভব। AB একটি গোলাকার অস্বচ্ছ বস্তু ইহার সম্মুখে অবস্থিত। এই ক্ষেত্রে বস্তু প্রভব অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর। উৎপন্ন ছায়ার CD অংশ প্রচ্ছায়া ও EC, DF অংশ উপচ্ছায়া। প্রচ্ছায়া শঙ্কু অভিসারী, কিন্তু উপচ্ছায়া অপসারী। সুতরাং
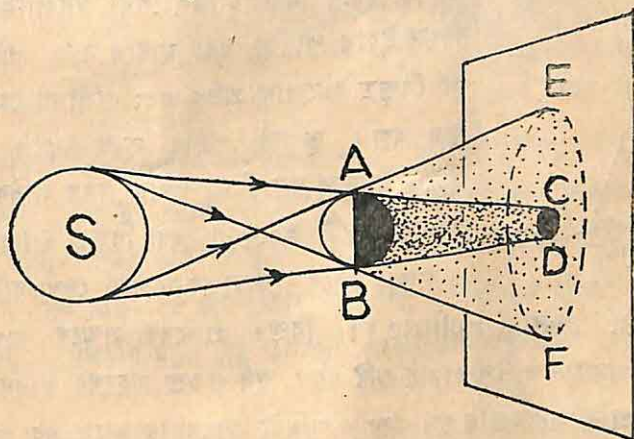
পর্দাকে দূরে সরাইলে উপচ্ছায়া ক্রমশঃ বাড়িবে, কিন্তু প্রচ্ছায়া ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে, অবশেষে একটি বিন্দুতে আসিয়া মিলিত হইবে। এই অবস্থায় পর্দার উপর কোন প্রচ্ছায়া পড়িবে না। সম্পূর্ণ ছায়াই উপচ্ছায়া। পর্দাকে আরও দূরে বসাইলে, প্রচ্ছায়া শঙ্কুর একটি বিপরীত অপসারী শঙ্কু সৃষ্টি হইবে। ইহাও উপচ্ছায়া। এই অংশে প্রভবের চারিপার্শ্ব হইতে আলো আসিয়া পড়ে, কিন্তু মধ্যস্থল হইতে কোন আলো আসে না। এই স্থান হইতে প্রভবের দিকে তাকাইলে প্রভবের মধ্যস্থল গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখাইবে এবং চতুর্দিকে একটি আলোর বলয় দেখা যাইবে।

৬.১৩. **পাখীর ছায়া ঃ** আমরা দেখিয়াছি যে, পাখী যখন নীচু দিয়া উড়িয়া যায় তখন তাহার ছায়া মাটিতে পড়ে। কিন্তু পাখী যখন উঁচু দিয়া উড়ে, তখন তাহার ছায়া মাটিতে পড়ে না। প্লেন যখন উঁচু দিয়া উড়িয়া যায় তখনও তাহার ছায়া মাটিতে পড়ে না। আমরা জানি যে, বিস্তৃত প্রভবের সম্মুখে যদি ক্ষুদ্র বস্তু রাখা যায় তাহা হইলে যে প্রচ্ছায়ার সৃষ্টি

হয় তাহার শঙ্কু অভিসারী। সুতরাং পর্দা দূরে বসাইলে প্রচ্ছায়া শঙ্কু একটি বিন্দুতে শেষ হইয়া বিপরীত অপসারী শঙ্কুর সৃষ্টি করিবে। অতএব সমস্ত ছায়াই উপচ্ছায়া হইবে। পর্দা দূরে থাকার জন্য এই উপচ্ছায়া বিস্তৃত স্থান ব্যাপিয়া হওয়ার জন্য অস্পষ্ট হইবে এবং চারিপার্শ্বের আলোকিত অংশ হইতে ইহার পার্থক্য ধরা যাইবে না। এই ক্ষেত্রে সূর্য বিস্তৃত আলোক প্রভব এবং পাখী বা প্লেন একটি ক্ষুদ্র বস্তু। ভূ-পৃষ্ঠ পর্দার কাজ করে। পাখী উঁচুতে উড়িলে বস্তু হইতে পর্দার দূরত্ব অধিক হওয়ায় প্রচ্ছায়ার সৃষ্টি হইবে না এবং বিস্তৃত উপচ্ছায়া ক্ষীণ ও অস্পষ্ট হইবে। ফলে কোন ছায়া দেখা যাইবে না।
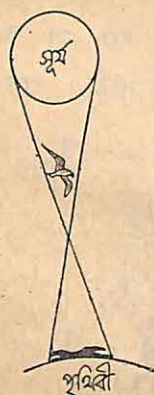
৬.১৪. গ্রহণ (Eclipse) : বিস্তৃত প্রভবের সম্মুখে অস্বচ্ছ বস্তু রাখিলে প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়ার সৃষ্টি হয়। সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণও ছায়ার সৃষ্টি। প্রতি অমাবস্যায় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একরেখায় আসে এবং চন্দ্র মধ্যে থাকে। চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পড়িয়া সূর্যগ্রহণের সৃষ্টি করে। প্রতি পূর্ণিমায় সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একরেখায় আসে এবং পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়িয়া চন্দ্রগ্রহণ সৃষ্টি করে। কিন্তু প্রত্যেক অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ ও প্রত্যেক পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ হয় না। ইহার কারণ প্রত্যেক পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র এক সরলরেখায় আসে না। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে যে কক্ষে ঘোরে, তাহা পৃথিবীর কক্ষতল এবং চন্দ্র পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে যে কক্ষে তাহা চন্দ্রের কক্ষতল। এই দুই কক্ষতল এক নহে। এই দুই তলের মধ্যে ৫° ব্যবধান আছে। ইহার ফলে পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর যুক্তরেখার একটু উপরে বা নীচে থাকে। ফলে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীতে পড়ে না বা পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পড়ে না। কোন বিশিষ্ট পূর্ণিমা বা অমাবস্যায় ইহারা এক সরলরেখায় আসে। তখনই গ্রহণ হয়।

(১) চন্দ্রগ্রহণ—যে পূর্ণিমায় সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী এক সরলরেখায় আসে এবং সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে পৃথিবী অবস্থান করে, তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রের

নিজস্ব কোন আলো নাই। সূর্যের আলোর জন্য ইহাকে উজ্জ্বল দেখায়। ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যখন পৃথিবীর প্রচ্ছায়া শঙ্কুর মধ্যে প্রবেশ করে, তখন চন্দ্র আর সূর্যের আলো পায় না, এবং চন্দ্রগ্রহণ সুরু হয়। যখন প্রচ্ছায়া
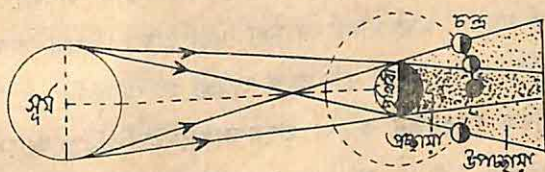
শঙ্কুর বাহিরে আসে, তখন গ্রহণ শেষ হয়। প্রচ্ছায়া শঙ্কুর মধ্যে প্রবেশের পূর্বে এবং প্রচ্ছায়া শঙ্কুর বাহিরে আসিবার পর চন্দ্র, পৃথিবীর উপচ্ছায়ায় প্রবেশ করে, সেইজন্য গ্রহণের পূর্বে ও পরে চন্দ্রকে ম্লান দেখায়।

(২) সূর্যগ্রহণ—যে অমাবস্যায় সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এক সরলরেখায় আসে এবং সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে চন্দ্র আসিয়া পড়ে তখন সূর্যগ্রহণ হয়। চন্দ্রের
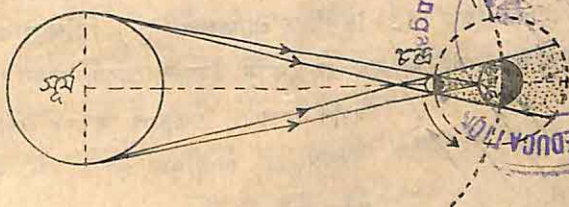
প্রচ্ছায়া শঙ্কু পৃথিবীকে যে অংশে স্পর্শ করে, সে স্থান হইতে সূর্যকে দেখিতে পাওয়া যায় না, সেই স্থানের লোকেরা সূর্যের পূর্ণগ্রাস দেখিতে পায় এবং যে সকল স্থানে উপচ্ছায়া শঙ্কু স্পর্শ করে, সেই স্থানের লোকেরা সূর্যের আংশিক গ্রহণ দেখিতে পায়। যদি কোন অমাবস্যায় চন্দ্রের প্রচ্ছায়া শঙ্কুর শীর্ষবিন্দু পৃথিবী স্পর্শ করে না সেইদিন সূর্যের পূর্ণগ্রাস গ্রহণ দেখা যায় না। চন্দ্র পৃথিবী অপেক্ষা অনেক ছোট বলিয়া ইহার প্রচ্ছয়া শঙ্কু খুব ছোট হওয়ায় ইহা পৃথিবীপৃষ্ঠে খুব অল্প স্থান স্পর্শ করে। সেইজন্য পৃথিবীর খুব অল্প স্থান হইতেই সূর্যগ্রহণ দেখা যায়।

৬.১৫. আলোর প্রতিফলন (Reflection of light) ঃ যে কোন সমসত্ব মাধ্যমে আলো সরলরেখায় চলাচল করে। কিন্তু যখনই আলো এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমের সম্মুখীন হয়, তখন ইহার সরলরৈখিক পথের দিক পরিবর্তিত হয়। স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়া আলো যখন অস্বচ্ছ মাধ্যমের তল স্পর্শ করে, তখন ইহার এক অংশ অস্বচ্ছ মাধ্যম কর্তৃক শোষিত হয় এবং অপর অংশ দিক পরিবর্তন করিয়া প্রথম মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে। ইহাকে আলোর প্রতিফলন বলে। আলোর কত অংশ প্রতিফলিত হইবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর (১) দুই মাধ্যমের প্রকৃতি, (২) আপতিত রশ্মি কিরূপ কোণে আপতিত হইল।

বায়ু হইতে কাচের তৈয়ারী সমতল দর্পণে আলো লম্বভাবে পড়িলে শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ আলো প্রতিফলিত হয়।

৬.১৬. নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন (Regular and diffused Reflection) ঃ প্রতিফলকের তলের আকৃতি ও প্রকৃতি অনুসারে প্রতিফলন দুইপ্রকার হয়। (১) নিয়মিত প্রতিফলন (২) বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন।

(১) **নিয়মিত প্রতিফলন**—যে কোন উজ্জ্বল, মসৃণ তলবিশিষ্ট বস্তুকে দর্পণ বলে। চকচকে ধাতব পাত, পারদের উপরিতল, সাধারণ কাচের আয়না দর্পণের কাজ করে।
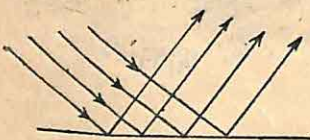
আলোর রশ্মিগুচ্ছ যখন কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়া যাইবার সময় কোন দর্পণে আপতিত হয়, তখন আপতিত আলোর প্রায় সমস্ত অংশই প্রতিফলক হইতে প্রতিফলিত হইয়া প্রথম মাধ্যমে ফিরিয়া আসে। এইরূপ প্রতিফলনকে নিয়মিত প্রতিফলন বলে। এইরূপ প্রতিফলনের কয়েকটি নিয়ম আছে। যদি আপতিত রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল হয়, তাহা হইলে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছও সমান্তরাল হইবে। নিয়মিত প্রতিফলনে যে দিকে প্রতিফলিত রশ্মি যায়, সেই দিক হইতে দর্পণের দিকে তাকাইলে দর্পণটিকে উজ্জ্বল ও চকচকে দেখাইবে। একটি অন্ধকার ঘরে একটি দর্পণ দেওয়ালে টাঙাইয়া ঘরের এক কোণ হইতে টর্চের আলো দর্পণে ফেলিলে, আলো

প্রতিফলিত হইয়া ঘরের আর এক অংশে পড়িবে। ফলে সেই অংশ আলোকিত হইবে। কিন্তু ঘরের অবশিষ্ট অংশ অন্ধকার থাকিবে এবং অন্ধকার অংশ হইতে দর্পণের দিকে তাকাইলে দর্পণটিকে অন্ধকার দেখাইবে।

(২) বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন—আলোক রশ্মিগুচ্ছ যখন কোন স্বচ্ছ মাধ্যমের মধ্য দিয়া যাইবার সময় কোন অমসৃণ তলে আপতিত হয়, তখন অমসৃণ তল হইতে রশ্মিগুচ্ছ বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপ প্রতিফলনকে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন বলে। এইরূপ প্রতিফলনে যদি আপতিত রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল হয়, তাহা হইলে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ আর সমান্তরাল থাকে না। একটি রশ্মি নিয়মিত প্রতিফলনের নিয়ম মানিলেও, সমগ্র রশ্মিগুচ্ছ কোন নিয়ম মানে না। বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনের জন্যই আমরা চতুর্দিকের জিনিসপত্র দেখিতে পাই। সূর্যের আলো বিভিন্ন বস্তুর উপর পড়িলে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়, তাহার ফলে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। অন্ধকার ঘরের এক কোণ হইতে টর্চের আলো সাদা দেওয়ালে ফেলিলে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হইবে। ফলে ঘরের যে কোন স্থান হইতে ঐ স্থানকে দেখা যাইবে এবং সমস্ত ঘরটি কিছুটা আলোকিত হইবে। দেখিবার সুবিধার জন্যই সিনেমার পর্দা অমসৃণ সাদা কাপড়ে তৈয়ারী করা হয়।
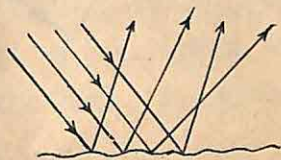
৬.১৭. নিয়মিত প্রতিফলন সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিষয়ঃ প্রতিফলকের উপর যে রশ্মি আসিয়া পড়ে তাহাকে আপতিত রশ্মি বলে। প্রতিফলক হইতে যে রশ্মি ফিরিয়া আসে, তাহাকে প্রতিফলিত রশ্মি বলে। প্রতিফলকের যে বিন্দুতে রশ্মি আপতিত হয়, তাহাকে আপতন বিন্দু বলে। আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর লম্বরেখাকে অভিলম্ব বলে। আপতিত রশ্মি ও অভিলম্বের মধ্যবর্তী কোণকে আপতন কোণ এবং অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মির মধ্যবর্তী কোণকে প্রতিফলন কোণ বলে।

৬.১৮. নিয়মিত প্রতিফলনের সূত্র (Laws of regular reflection): নিয়মিত প্রতিফলন দুইটি সূত্র অনুযায়ী ঘটিয়া থাকে—(১) আপতিত রশ্মি,

প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলকের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব
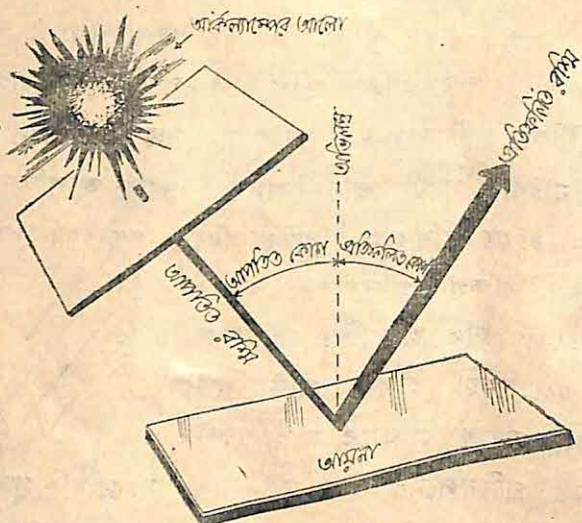
এক সমতলে থাকিবে। (২) আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ পরস্পর সমান।

প্রতিফলন সূত্রের পরীক্ষা : **হার্টলের আলোকচক্র পদ্ধতি :** একটি দণ্ডের উপর একটি পাতলা বৃত্তাকার ধাতবচক্র খাড়াভাবে বসান আছে। চক্রের পরিধি বরাবর প্রায় অর্ধেক ঘিরিয়া একটি চওড়া ধাতুর পাত আছে এই পাতে একটি সরু ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া চক্রের তলে আলোকরশ্মি আপতিত হয়। চক্রের পরিধি চারি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি ব্যাসের দুই প্রান্তে $0°-0°$ দাগ কাটা এবং ইহার লম্ব ব্যাসের দুই প্রান্ত ৯০°—৯০° দাগ কাটা আছে। প্রত্যেকটি ভাগ $0°$—৯০° অংশাঙ্কন করা আছে। চক্রটি উহার কেন্দ্রের মধ্যস্থ অনুভূমিক রেখায় ঘুরান যায়। চক্রের ৯০°—৯০° রেখা বরাবর চক্রের কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র সমতল দর্পণ বসান আছে।
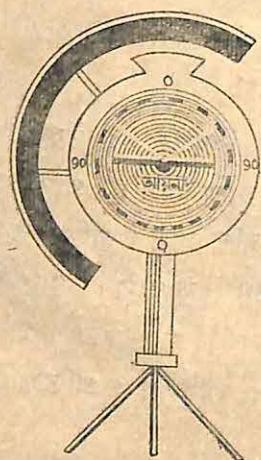
অতএব 0°—0° রেখা ইহার অভিলম্ব। ছিদ্রের অপর পার্শ্বে একটি মোমবাতি জ্বালিয়া বসান হইল। ছিদ্র দিয়া আলোকরশ্মি চক্রের তল বাহিয়া দর্পণের কেন্দ্রস্থলে আপতিত হয় এবং প্রতিফলিত হইয়া চক্রের তল বাহিয়া যায়। আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি ও অভিলম্ব চক্রের তলে অবস্থিত। সুতরাং প্রথম সূত্র প্রমাণিত হইল।

আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি অভিলম্ব 0°—0° রেখার সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাদের মান সমান। চক্রকে সামান্য ঘুরাইয়া যে কোন কোণে রশ্মিকে আপতিত করিয়া দেখা যায় যে, সর্বদাই আপতন ও প্রতিফলন কোণের মান পরস্পর সমান। ইহা হইতে দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণিত হইল।

৬.১৯. প্রতিবিম্ব (Image) : দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইলে দর্পণে নিজের মুখ দেখা যায়। ইহাই প্রতিবিম্ব। কোন বস্তু হইতে আলোক রশ্মি কোথাও বাধা না পাইয়া যখন সোজা চোখে আসিয়া পড়ে, তখনই বস্তুকে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু বস্তু হইতে আলো সোজা চোখে না আসিয়া প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর চোখে আসিয়া পড়ে তখনও বস্তুকে দেখা যায় এবং বস্তুকে অন্য স্থানে দেখা যায়। বস্তুর ঐ দ্বিতীয় অবস্থানকে উহার প্রতিবিম্ব বলে।

যখন কোন বিন্দু প্রভব হইতে রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত হইয়া অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয় বা অন্য কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলে।

প্রতিবিম্ব দুই প্রকার—(১) সদবিম্ব, (২) অসদ্ বিম্ব। যখন কোন বিন্দু প্রভব হইতে রশ্মিগুচ্ছ নির্গত হইয়া কোন তলে প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দিক্ পরিবর্তন করিয়া সত্য সত্যই কোন বিন্দুতে মিলিত হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর সদ্‌বিম্ব বলে। উত্তল লেন্সের সাহায্যে সদ্-বিম্ব গঠন করা যায়। সদ্‌বিম্বের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং পর্দায় ফেলা যায়। যখন কোন বিন্দু প্রভব হইতে রশ্মিগুচ্ছ নির্গত হইয়া কোন তলে প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর অন্য কোন বিন্দু হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর অসদ্ বিম্ব বলে।

অসদ্ বিম্বের কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই। ইহাকে পর্দায় ফেলা যায় না। সমতল দর্পণে অসদ্ বিম্ব গঠিত হয়।

৬.২০. **সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন ঃ** সমতল দর্পণের সম্মুখে কোন বস্তু রাখিলে, দর্পণের পিছনে ইহার অসদ্ বিম্ব দেখা যায়। MN একটি সমতল দর্পণ। ইহার সম্মুখে OR একটি উজ্জ্বল বস্তু। O বিন্দু হইতে
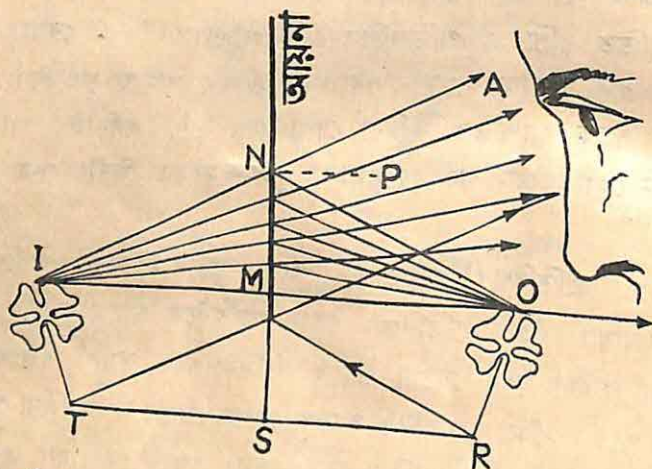
অপসারী রশ্মিগুচ্ছ দর্পণে পাড়িয়া প্রতিফলিত হয় এবং দর্পণের পশ্চাতে I' বিন্দু হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছ চোখের মধ্যে প্রবেশ করিলে IT প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। প্রমাণ করা যায় যে, দর্পণ হইতে বস্তু যত দূরে থাকিবে, দর্পণ হইতে প্রতিবিম্ব তত দূরেই হইবে।

৬.২১. **পার্শ্ব সরণ (Lateral inversion) ঃ** যখন আমরা দর্পণে
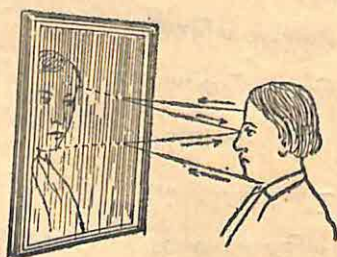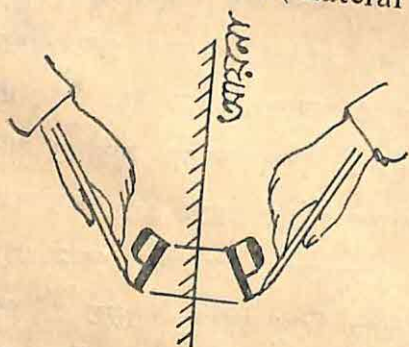
নিজেদের শরীর দেখি, তখন আমাদের ডান হাত, বাম হাতের মত দেখায় ও বাম হাত ডান হাতের মত দেখায়। ইহাকেই দর্পণ কর্তৃক পার্শ্ব সরণ বলে।

৬.২২. সমান্তরাল দর্পণ ও পেরিস্কোপ ঃ দুইটি দর্পণকে ঘরের দুই বিপরীত দেওয়ালে টাঙাইয়া মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া যে কোন দর্পণে তাকাইলে মুখের অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। চুল ছাঁটিবার সময় সেলুনে চেয়ারে বসিয়া সম্মুখের দর্পণে তাকাইলে, সম্মুখের ও পশ্চাতের দুইটি সমতল দর্পণে পরপর মাথার সামনের ও পিছনের দিকের প্রতিবিম্ব দেখা যায়।
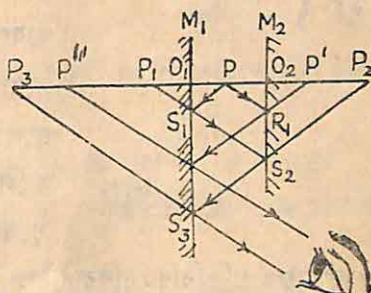
M_1 ও M_2 দুইটি সমান্তরাল সমতল দর্পণ। ইহাদের মধ্যস্থলে P একটি জ্বলন্ত মোমবাতি। P হইতে যে রশ্মি M_1 দর্পণে আপতিত হইল, তাহা ক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত হইয়া P_1, P_2, P_3 প্রভৃতি প্রতিবিম্ব গঠন করিবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে বস্তুর দূরত্ব ও প্রতিবিম্বের দূরত্ব সমান হইবে। অনুরূপে P হইতে যে রশ্মি M_2 দর্পণে আপতিত হইল তাহা ক্রমান্বয়ে প্রতিফলিত হইয়া P', P'' প্রভৃতি প্রতিবিম্ব গঠন করিল। দুইটি দর্পণের মধ্যস্থলে চোখ রাখিয়া যে কোন দর্পণে তাকাইলে অসংখ্য প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। প্রত্যেক প্রতিফলনে কিছু আলো শোষিত হয় বলিয়া কয়েকটি প্রতিবিম্ব দেখা যাইবার পর আর দেখা যায় না।

৬.২৩. সরল পেরিস্কোপ ঃ দুইটি সমান্তরাল দর্পণের প্রতিবিম্ব গঠনের নীতি অবলম্বন করিয়া সরল পেরিস্কোপ প্রস্তুত করা হয়। দুইটি ছোট সমতল দর্পণ একটি কাঠের বা ধাতব নলের উপরে ও নীচে 8৫° কোণ করিয়া সমান্তরালভাবে বসান আছে। দর্পণদ্বয়কে সমান্তরাল রাখিয়া সমস্ত নলটিকে ঘুরান যায়। উপরের দর্পণকে দূরের কোন বস্তুর দিকে ধরিয়া, নীচের দর্পণের দিকে তাকাইলে দূরের বস্তুর প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে। সম্মুখে কোন বাধা থাকিলে বাধা ডিঙাইয়া দূরের বস্তুকে দেখিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা যায়।

খেলার মাঠে, বেড়ার বাহিরে বসিয়া বেড়ার উপরে পেরিস্কোপের নল উঠাইয়া ধরিলে বেশ পরিষ্কার খেলা দেখা যায়। ডুবো জাহাজে এই পেরিস্কোপের ব্যবহার খুবই প্রয়োজনীয়। জাহাজ জলের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া পেরিস্কোপের নলটিকে জলের উপরে রাখিলে দূরের শত্রুজাহাজ ও জলের উপরের অন্যান্য বস্তু দেখিতে পায়। যুদ্ধের সময় পরিখার মধ্যে বসিয়া দূরের শত্রুসৈন্যের গতিবিধি দেখিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়।
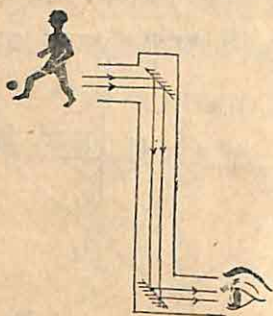
৬.২৪. বিভিন্ন কোণে আনত দুইটি দর্পণ : সমকোণে আনত দুইটি সমতল দর্পণের মধ্যে একটি জ্বলন্ত মোমবাতি রাখিলে, মোট তিনটি প্রতিবিম্ব দেখা যায়। বস্তু ও তিনটি প্রতিবিম্ব একটি আয়তক্ষেত্র গঠন করে।
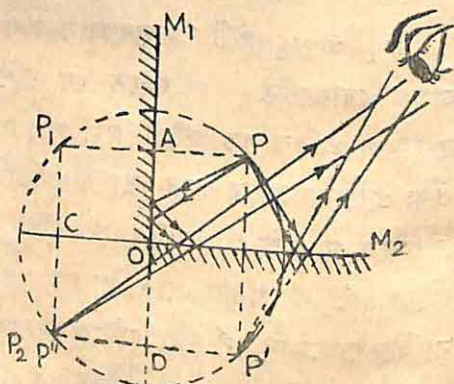
ক্যালিডোস্কোপ : ৬০° কোণে আনত দুইটি দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠনের নীতির উপর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের একটি সুন্দর খেলনা তৈয়ারী হয়। একটি লম্বা নলের মধ্যে দুইটি সরু লম্বা দর্পণ ৬০° কোণে আনত করিয়া বসান থাকে। নীচের মুখ একটি ঘষা কাচের প্লেট ও উপরের মুখ একটি শক্ত কার্ডবোর্ড প্লেট দ্বারা ঢাকা—কাচের প্লেটের উপর কয়েকটি রঙীন কাচের টুকরা রাখা আছে। দর্পণ দুইটি ৬০° কোণে আনত থাকায় প্রত্যেকটি কাচের টুকরার পাঁচটি করিয়া প্রতিবিম্ব গঠিত হইবে এবং প্রতিবিম্বগুলি একটি সুন্দর নক্সা তৈয়ারী করিবে। নলটি একটু ঘুরাইয়া কাচখণ্ডগুলির অবস্থানের পরিবর্তন করিলে এইরূপে অসংখ্য নক্সার সৃষ্টি হইবে।

———

প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

১। প্রাচীন ও আধুনিক কালে আগুন জ্বালাইবার পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। কয়েকটি জ্বালানীর নাম ও ব্যবহার লিখ।

২। 'বিজ্ঞান, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান,' ইহা উদাহরণ দ্বারা ব্যাখ্যা কর।

৩। দাহ্য ও অদাহ্য পদার্থ বলিতে কি বুঝ? কয়েকটি দাহ্য ও অদাহ্য পদার্থের নাম বল।

৪। বিজ্ঞান সাধনার উদ্দেশ্য কি? ইহার বিভিন্ন শাখার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৫। চিকিৎসাশাস্ত্র ও খাদ্য সংস্থানে বিজ্ঞানের ব্যবহার উদাহরণ সহকারে বুঝাইয়া দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। বায়ুর ওজন আছে—একটি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

২। বায়ুমণ্ডল কাহাকে বলে? বায়ুমণ্ডলের চাপ বলিতে কি বুঝ? ইহার মান কত?

৩। 'বায়ুমণ্ডল চতুর্দিকে চাপ প্রদান করে'—একটি সহজ পরীক্ষাদ্বারা ইহা প্রমাণ কর। ম্যাগডেবার্গ অর্ধগোলক পরীক্ষাটি বর্ণনা কর।

৪। টরিসেলি কে ছিলেন? তিনি কি বিষয়ে পরীক্ষা করেন? 'টরিসেলির শূন্যস্থান' কাহাকে বলে? ইহা সত্যসত্যই শূন্য কিনা?

৫। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(i) টরিসেলির নলটি কাত করিলে পারদস্তম্ভের উচ্চতা কি ঠিক থাকিবে?

(ii) কূপের গভীরতা ৩৪ ফুটের অধিক হইলে, পাম্প দ্বারা জল তোলা সম্ভব নয় কেন?

(iii) উঁচু পাহাড়ে উঠিলে নাক-মুখ দিয়া রক্ত বাহির হয়। কেন?

৬। বায়ুর উপাদান কি কি? বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ, যৌগিক পদার্থ নহে, যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৭। মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ বলিতে কি বুঝ? ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় কয়েকটি মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের নাম লিখ।

৮। টীকা লিখ :—

(i) পরিস্রাবণ ও পরিস্রুত (ii) ঊর্ধ্বপাতন (iii) পাতন (iv) কেলাসন।

৯। (i) গন্ধক ও লোহাচুরের মিশ্রণ হইতে উপাদানগুলি কি করিয়া পৃথক করিবে? (ii) চিনি মিশ্রিত জল হইতে চিনি ও জলকে কি উপায়ে পৃথক করিবে?

তৃতীয় অধ্যায়

১। প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(i) তরলের চাপ কি গভীরতার উপর নির্ভর করে?

(ii) শহরের জল সরবরাহ ব্যবস্থা তরলের কোন ধর্মের উপর নির্ভর করে?

(iii) বরফ জলে ভাসে কেন?

২। তরলের চাপ কাহাকে বলে? তরলের মধ্যে যে কোন স্থানে তরল চতুর্দিকে সমান চাপ প্রদান করে—পরীক্ষা দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দাও।

৩। আর্কিমিডিসের সূত্র কাহাকে বলে? কি পরিস্থিতিতে তিনি ঐ সূত্র আবিষ্কার করেন? ইহার সত্যতা কিরূপে নির্ধারণ করিবে?

৪। বস্তুর আপাত ওজন ও প্লবতা কাহাকে বলে? লোহা জল অপেক্ষা ভারী, কিন্তু লোহার জাহাজ জলে ভাসে কেন?

চতুর্থ অধ্যায়

১। পদার্থের বিভিন্ন ভৌত অবস্থা বল। পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও যে, পদার্থের ভৌত অবস্থা পরিবর্তনশীল।

২। প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :—

(i) দুইটি রেললাইনের মধ্যে ফাঁক রাখা হয় কেন?

(ii) টেলিগ্রাফের তার দুইটি খুঁটির মাথায় খাটাইবার সময় বেশ কিছুটা ঝুলাইয়া দেওয়া হয় কেন?

(iii) একটি মোটা কাচের গ্লাসে ফুটন্ত জল ঢালিলে গ্লাসটি ফাটিয়া যায় কেন?

(iv) গরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় কিরূপে পরান হয়?

(v) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অণু ও পরমাণু অংশ গ্রহণ করে কিনা?

৩। সকল বস্তুকে তাপ দিলে প্রসারণ হয়—পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৪। বিভিন্ন ধাতুর প্রসারণ বিভিন্ন, কিরূপে প্রমাণ করিবে?

৫। ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তন বলিতে কি বুঝ?

পঞ্চম অধ্যায়

১। নিউটন কে ছিলেন ? তাঁহার কয়েকটি আবিষ্কারের বিষয়ে কি জান ?

২। মাধ্যাকর্ষণ ও অভিকর্ষ কাহাকে বলে ? পৃথিবী পৃষ্ঠে এক ব্যক্তি ২ মিটার উঁচুতে লাফাইতে পারিলে, চাঁদে লাফাইয়া সে কত উঁচুতে উঠিবে ? উহার কারণ বল।

৩। পতনশীল বস্তুর নিয়ম কি ? গিনি ও পালকের পরীক্ষা বর্ণনা কর।

৪। জোয়ার ও ভাটা কাহাকে বলে ? ইহারা কিজন্য হয় ?

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। বর্তমান সৌরজগৎ সম্বন্ধে কেপলার ও গ্যালিলিও কি তথ্য প্রমাণ করেন ?

২। গ্রহ ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য কি ?

৩। আলো সরলরেখায় চলে—পরীক্ষা দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দাও।

৪। সূচী ছিদ্র ক্যামেরার চিত্রসহ বর্ণনা ও কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর।

৫। ছায়ার উৎপত্তি কিরূপে হয় ? প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া কাহাকে বলে ? চিত্রসহ বুঝাইয়া দাও।

৬। সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কিরূপে হয় ? প্রত্যেক পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ও প্রত্যেক অমাবস্যায় সূর্য গ্রহণ হয় না কেন ?

৭। নিয়মিত ও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন কাহাকে বলে ? আলোর পার্শ্বসরণ কি ?

৮। প্রতিফলনের সূত্রগুলি লিখ। হার্টলে আলোক চক্রের সাহায্যে কিরূপে সূত্রগুলি প্রমাণ করা যায় ?

৯। দুইটি দর্পণ সমান্তরাল বা সমকোণে রাখিয়া মধ্যে একটি মোমবাতি রাখিলে কতগুলি প্রতিবিম্ব দেখা যায় ?

১০। রাত্রির আকাশে কয়েকটি বিখ্যাত নক্ষত্রের নাম বল।

১১। সৌরমণ্ডল সম্বন্ধে কি জান সংক্ষেপে বল।

১২। সূর্য, চন্দ্র, উল্কা সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।